বঙ্গবন্ধু
দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন

আবীর আহাদ

বঙ্গবন্ধু : দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন ■ আবীর আহাদ

ISBN 984-8139-02-8

'৭৩-'৭৪ সাল। সবেমাত্র তাঁর সাংবাদিকতা ও লেখার জগতে পদার্পণ। একজন টগবগে যুবক। চোখে-মুখে রোমান্টিকতার ছাপ। না, কবিতার দিকে তাঁর তেমন ঝোঁক নেই। রাজনীতি তথা দর্শনের দিকেই এগুতে থাকলেন আবীর আহাদ। রাজনীতি-দর্শন মানেই তো জটিল গবেষণার বিষয়। এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি। অর্থাৎ তাঁর জটিল বিষয়াবলীর মধ্যেই এক ধরনের প্রশংসনীয় মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। যখন '৭৭ সালে সাহিত্য ও গবেষণামূলক সাময়িকী 'আজকাল' ও '৮০ সালে সাপ্তাহিক 'বঙ্গকণ্ঠ' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তখনও দেখা গেছে, তিনি বেশকিছু তত্ত্বগত বিষয়ের অবতারণা করে সামাজিক মানুষের ভাবনার বিকাশ এবং বাস্তব উত্তরণের বিবিধ জটিলতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লব করতে চেয়েছেন, নাকি বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করে পুরো জাতির অন্তরাত্মায় এক ধরনের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন সেসবের কোন ব্যাখ্যা আজো হয়নি। সবাই, সময়ের আকস্মিক পরিবর্তনে, একটু করে গা-বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। এমনও দেখা গেছে যে প্রগতিবাদিরা বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন করার কথা, তারাও নির্বিশেষে বিরুদ্ধবাদীদের অন্ধ-সমালোচনার মোকাবিলা না করে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করার বিতর্কিত বিজ্ঞতার নিস্পৃহ মানসিকতা প্রদর্শন করেছেন।

আবীর আহাদ তাঁর গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহের তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কাজটি অবশ্যই বিভিন্নমুখি তীর্যক আলোর প্রক্ষেপণ ক্ষমতাসহ বিজ্ঞান ও দর্শনের সমবায়ে পরিচালিত রাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করার মত মেধাশক্তির দাবি রাখে। আমার ধারণা আবীর আহাদ আলোকিত সড়কের কাছাকাছি পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছেন। পাশাপাশি, তিনি কঠোর পরিশ্রমে, আলোর রেখাগুলো অন্ততঃপক্ষে চিহ্নিত করেছেন। এটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়।

আবীর আহাদ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সাংবাদিকতা ও সাহিত্যাঙ্গনের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। '৭১-এর বীর মুক্তিযোদ্ধা আবীর আহাদ বাংলাদেশের সুদীর্ঘকালীন স্বাধীনতা সংগ্রাম, '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর ব্যাপক গবেষণাকর্মে লিপ্ত থেকে ২০/২২টি ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রবর্তক। তন্মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থসহ 'বঙ্গবন্ধুঃ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯২ সালের প্রকাশনাঙ্গনে উক্ত গ্রন্থ দু'টি ছিল সবচে' আলোচিত গ্রন্থ। 'বঙ্গবন্ধুঃ দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন' গ্রন্থটিও আলোড়ন সৃষ্টি করবে তাতে সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিরুদ্ধমহল থেকে সীমাহীন মিথ্যাচার ও অপপ্রচারণার যেসব বিষবাস্প ছড়ানো হয়েছে, প্রথমেই সে-সবের শক্তিশালী জবাব দিলেন আবীর আহাদ–অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ যুক্তিতর্কে ও বাক্যশৈলীতে। তাঁর বৈশিষ্ট্যই হলো, তিনি বক্তব্য দেন খোলামেলা, মুক্তমনে–নির্ভীক শব্দচয়নে, বিপ্লবাত্মক ভঙ্গিতে। গ্রন্থখানি বঙ্গবন্ধু নিন্দুকদের মুখে ছাই নিক্ষেপ করবে। নির্মল পূতঃপবিত্র বঙ্গবন্ধুর সপ্রতিভসত্তায় বাঙালী জাতির হৃদয়পটে ফুলেলস্নিগ্ধ শ্রদ্ধা নিয়ে প্রোজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠবেন।

বঙ্গবন্ধু
দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন

আবীর আহাদ

পরিবেশক
জ্যোৎস্না পাবলিশার্স

৯ম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী-২০০৪
প্রথম প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর-১৯৯১
প্রকাশক : আলী আহমেদ, সভাপতি, বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠী
৪৪ নবাবপুর রোড (শিউলী বাড়ী), ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন
পরিবেশক : জ্যোৎস্না পাবলিশার্স
১২/১৩, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০, ফোন-৭১১৮৩৩০
মুদ্রণে : আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, হৃষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১১০০
মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র
ISBN- 984 8139 02 8

স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্মের উদ্দেশে
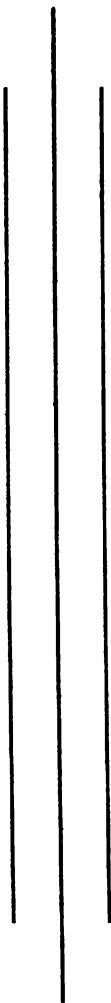
মুজিব মানে স্বাধীনতা মুজিব মানে মুক্তি
সাম্য মৈত্রী সমৃদ্ধির চিরন্তন এক যুক্তি

আবীর আহাদ-এর অন্যান্য গ্রন্থ

বঙ্গবন্ধুঃ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

বঙ্গবন্ধু ঃ কারাজীবন সংগ্রাম স্বাধীনতা

বঙ্গবন্ধু বিরোধী মিথ্যাচার ঃ বাংলাদেশের রাজনীতি

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে

জয়বাংলা বঙ্গবন্ধু বাঙালি

বাংলাদেশ ঃ জেনারেল জিয়ার রাজনীতি

বাংলাদেশ ঃ বিভীষিকাময় রক্তাক্ত রাতগুলো

প্রাত্যাহিক সুখ (কাব্যগ্রন্থ)

সূচিপত্র

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সার্বিক রাজনৈতিক দর্শন, আর্থসামজিক প্রশাসনিক কর্মসূচি ও ব্যবস্থার ওপর তরুণ সাংবাদিক সাহিত্যিক স্নেহাস্পদ আবীর আহাদ প্রণীত "বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন' গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি বিপুলভাবে চমৎকত ও মুগ্ধ হয়েছি। আমরা জানি, রাজনৈতিক দর্শনই আর্থসামাজিক প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি নির্ণিত ও পরিচালিত করে থাকে। আমার বিশ্বাস, লেখক সেই প্রেক্ষাপটেই তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন এবং সেটা খুবই যথার্থ হয়েছে।

লেখক পৃথিবীর আদিকালের সাম্যবাদী সমাজ হতে শুরু করে দাসপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথার সামন্তবাদী সমাজ—পরবর্তীকালের ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং মানবজাতির রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার বিকাশ বিবর্তনের ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তাত্ত্বিক-তথ্যনির্ভর বিষয়াবলীর ওপর বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করে যেভাবে এবং যে দৃষ্টিকোণ থেকে জাতির জনকের চিন্তাধারা এ গ্রন্থে গ্রোথিত করেছেন—সে কারণেই নিঃসন্দেহে সকলের কাছে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য ও সমাদৃত হবে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর অগুণতি অনুসারীরা তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে পারবেন এবং যারা তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ ও ভ্রান্তধারণা পোষণ করেন, তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিতে এ গ্রন্থখানি পুরোপুরি সক্ষম হবে বলে আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস।

এ ব্যতীত যে সকল জ্ঞানপাপী বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ও তাঁর সম্পর্কে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণ মনোভাব পোষণ করেন, প্রদর্শন করেন—এ গ্রন্থখানি তাঁদেরকে জ্ঞাত করতে সক্ষম হবে যে, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক চিন্তা কতো সুগভীর ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী—কতো প্রখর প্রবল স্বচ্ছ এবং কতো বাস্তবধর্মী। আর তাই তাঁর সার্বিক জীবনযোগ্যতাও কতো সুতীক্ষ্ণ ও প্রত্যয় দীপ্তদৃপ্ত।

এ প্রসঙ্গে আমি বলে দিতে চাই যে, বাঙ্গালীর আবহমানকালের মন-মনন প্রকৃতি ও বাঙ্গালীত্বের যাবতীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ বঙ্গবন্ধু নিজ দেহ-মন-রক্তে এমনভাবেই ধারণ করে নিয়েছিলেন যে, তিনিই কেবল আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বলতে পারতেন, 'আমিই বাংলাদেশ' এবং এই তাঁর বাংলা ও বাঙ্গালীর হৃদয়ের আশা-

আকাংখা ও অভিব্যক্তির কথা বঙ্গবন্ধুর চেয়ে আর কেউ বেশি জানতে ও বুঝতে পেরেছেন—পারেন বা পারবেন, সেটা আমি কেনো কেউ তা বিশ্বাস করতে পারবেন না। এসব গুণাবলী নিজ জীবনযোগ্যতা বলে তিনি অর্জন করেছিলেন। তিনি নিজেই ছিলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা ইন্‌সটিটিউশন। তিনি বাংলা ও বিশ্বের সকল শোষিত নিষ্পেষিত নির্যাতিত অত্যাচারিত সর্বহারা মুক্তিকামী মানুষের মুক্তিদূত। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ "বিশ্ব আজ দুইভাগে বিভক্ত। শোষক এবং শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে। আমার কণ্ঠ শোষিতের মুক্তির জন্যে চিরকাল সোচ্চার থাকবে।"

এসবই তাঁর জীবনযোগ্যতার সার্বিক পরিণতি। এ কারণেই তিনি বিশ্বশান্তির প্রতীক। বিশ্বশান্তি পরিষদ তাই যথার্থই তাঁকে 'জুলি ও কুরি' শান্তিপদকে সম্মানীত করেছেন। তিনি নিজ জীবনযোগ্যতার কার্যক্রমের গুণে মহামতি লেনিন, হোচিমিন, দ্যাগল, আব্রাহাম লিংকন, মাও সে তুং প্রমুখ বিশ্বব্যক্তিত্বের পাশাপাশি নিজের অবস্থান জীবদ্দশায়ই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু বাল্যকাল থেকেই ছিলেন বিপ্লবী। তাই তাঁর সংগ্রাম, ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে—পাকিস্তানী স্বৈরাচারী শাসক শোষকদের ললাটে পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামে পর্যবেশিত হয়েছিলো। এরপরই তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বা অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়। যে দীনদুখি মেহনতী শোষিত বাঙ্গালীর মুখে হাসি ফুটানোর লক্ষ্যে—তাদের মোটা ভাত, মোটা কাপড়, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে এবং তাদের প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবনযৌবনের মধুর বছরগুলো সাম্রাজ্যবাদের ক্রিড়ানক সামরিক একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী পাকিস্তানের বর্বর শাসক-শোষকদের কারাগারে বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই তাদের জন্যে যখন তিনি সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর ও সর্বদলীয় বাঙ্গালীর জাতীয় ঐক্যের প্রতীক জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্টান 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশালের কর্মসূচির মাধ্যমে একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা ঘোষণা করলেন—তখনই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার এদেশীয় অনুচর সেবাদাস উঠতি ধনিক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী রাজনীতিক সামরিক বেসামরিক আমলারা প্রমাদ গণলো। তারা চোরাগলিতে রাতের অন্ধকারে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। এমনি অবস্থায় '৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাদের ভাড়াটিয়া গুন্ডাদের হাতে নির্মমভাবে পরিবার পরিজনসহ বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। তারা ভেবেছিলো, এভাবেই তাদের কায়েমী হীন স্বার্থ চরিতার্থ হবে। ভেবেছিলো, মুজিবকে হত্যা করলে সবকিছু শেষ

হয়ে যাবে। মুছে যাবে। কিছু ইতিহাস বড়োই নির্মম। সত্য ও ন্যায়ের আদর্শকে সে তার পাতায় ঠাঁই দিয়ে অনন্তকালের দিকে দুর্বারগতিতে ছুটে চলে।

তাই তো শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক কারণেই আবার বাংলার বুকে ফিরে এসেছেন সমাজতান্ত্রিক ও শোষণহীন সমাজ বিনির্মাণের আদর্শের মূর্তপ্রতীক হিসেবে। আদর্শ মুজিব চিরঞ্জীব ও চিরবিপ্লবী।

স্নেহপ্রতিম আবীর আহাদ সেই আদর্শ মুজিবকে তুলে ধরেছেন। আমি তাঁর গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

জয় বাংলা

ডঃ আবদুল মতিন চৌধুরী

প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, বোস প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
অনারারী মেম্বার, আন্তর্জাতিক নোবেল প্রাইজ কমিটি;
সদস্য, নেহেরু শান্তি পরিষদ,
নির্বাচিত ফেলো, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি;
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ।

৯ম সংস্করণ বিষয়ে দু'টি কথা

বাকশাল। দ্বিতীয় বিপ্লব। শোষিতের গণতন্ত্র। এসবের কারণে বঙ্গবন্ধু হত্যাযজ্ঞ। বাকশাল কী। কেন। কী ছিলো এর মধ্যে। এসব প্রশ্নের জবাব দিতেই 'বঙ্গবন্ধু ঃ দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন' গ্রন্থখানি ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এ গ্রন্থখানি লিখেছিলাম বঙ্গবন্ধুর ব্যাখ্যা অনুযায়ী। গ্রন্থটি প্রকাশের পর রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি ঢেউ উঠেছিল। তারপর একে একে আটটি সংস্করণ বের হয়েছে। তবুও এর রেশ এখনো ফুরায়নি বলেই ৯ম সংস্করণের অবতারণা। বাকশাল প্রবর্তনের পর থেকে অদ্যাবধি আলোচনা-সমালোচনার বন্যা বয়েই চলেছে। সমাজে নতুন নতুন মুখ আসছে—নতুন করে তাই বাকশালও আলোচনায় স্থান পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি জনাব আলী আহমদ ৯ম সংস্করণ প্রকাশ করে এই নতুনদের হাতে গ্রন্থটি তুলে দেয়ার যে উদ্যোগ নিয়েছেন আমি তাকে স্বাগতঃ জানাই।

অতীতের মতো এবারও রাজনৈতিক অঙ্গনে বাকশালকে কেন্দ্র করে যে অপপ্রচারণা, বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচারের হলাহল সৃষ্টি হয়েছে, তার একটি জবাব নতুন প্রজন্মের পাঠক সমাজ খুঁজে নিতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। সময়ের অভাবে গ্রন্থটির ভেতরে কোনো প্রকার পরিবর্তন বা অতীতের অনেক দুর্বলতা পরিহার করা গেল না, এ জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে বিষয়টি দেখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আশা করি আবার গ্রন্থটি বঙ্গবন্ধুবিরোধীদের উপযুক্ত জবাব দিতে সক্ষম হবে। জয় বাংলা।

২৫ জানুয়ারী ২০০৪ — আবীর আহাদ
ঢাকা

পূর্বকথা

২৫ শে জানুয়ারী ১৯৭৫ সাল।
স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের এক রাজনৈতিক যুগসন্ধিক্ষণ। প্রচলিত পুঁজিবাদী শোষকের গণতন্ত্র থেকে সমাজতান্ত্রিক বা শোষিতের গণতন্ত্রে উত্তরণের এক মহা-আকাংখিত দিন।

জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে সংসদীয় পদ্ধতি থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হলো ঐ শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে। আর ঐ পদক্ষেপের বাস্তবায়ন ঘটলো ২৪ শে ফেব্রুয়ারীতে—বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল নামক একক জাতীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের মধ্য দিয়ে।

বঙ্গবন্ধু এই বাকশালের মাধ্যমে বাংলার দীন-দুখী মেহনতী শোষিত মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিলেন, যাকে তিনি 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বা 'শোষিতের গণতন্ত্র' নামে অভিহিত করেছেন। এ উদ্দেশে তিনি তাঁর রাষ্ট্রীয় চার মৌলনীতি যথা গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের আদর্শসমন্বিত রাজনৈতিক আর্থসামাজিক প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন।

কিন্তু স্বাধীনতা স্বনির্ভরতা তথা আর্থসামাজিক মুক্তির মহাশত্রু সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-নয়াউপনিবেশবাদের ইংগীতে দেশীয় সেবাদাস দোসর উঠতি ধনিক-শোষক, উচ্চাভিলাসী সামরিকজান্তা, স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়াশীলচক্র অর্থ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উদগ্রলালসায় মদমত্ত হয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর অপরাধ ? তিনি বাকশাল করে এ দেশে সাম্রাজ্যবাদী নয়াউপনিবেশবাদী পুঁজিবাদী আধাসামন্তবাদী শোষকদের প্রতারণামূলক গণতান্ত্রিক শাসন-শোষণের চির অবসান ঘটিয়ে শোষিত মেহনতি দুখী মানুষের স্বাধীনতা ও আর্থসামাজিক মুক্তি নিশ্চিত ও একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক শোষণহীন সমাজ তথা সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। ঐ মহাপরিকল্পনার অগ্রিম ফলাফল অনুধাবন করে বাকশাল ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উষালগ্নেই তারা বঙ্গবন্ধুকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। থামিয়ে দেয় দ্বিতীয় বিপ্লবের খরস্রোতকে। প্রতিবিপ্লবী খুনী প্রতারক দানবীয় শোষকচক্র প্রচলন করে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধ চেতনাবিরোধী গণ-মানবতাবিরোধী শোষণবাদী প্রতারণামূলক ধারাকে—যে ধারা বর্তমানেও প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় বিপ্লব—শোষিতের গণতন্ত্র কী; কী ছিলো তাঁর লক্ষ্য ও কর্মসূচি—আলোচ্য গ্রন্থে সে-বিষয়েই বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুরই নিজস্ব গাইডলাইন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। একজন মুক্তিযোদ্ধা ও তরুণ সাংবাদিক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বাকশাল পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর থেকে তাঁর নিহত হওয়ার পূর্ব-পর্যন্ত সময়কালের ভেতর বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার বেশ কয়েকবার সাক্ষাত ঘটে। দ্বিতীয় বিপ্লব ও তাঁর পরিকল্পিত কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা নেয়া এবং ভবিষ্যতে এর ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থরচনা করার পরিকল্পনা নিয়েই আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে বার বার ছুটে গিয়েছি। তৎসময়ের প্রেক্ষিতই যেন আমাকে তাড়িত করতো। মহানবীর ইসলামী বিপ্লব ও মহান রুশ বিপ্লবের শিক্ষা থেকে আমার মনে এ ধারণা জন্ম নিয়েছিলো যে, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব অবশ্যই প্রতিবিপ্লবের ধারকদের—শোষক প্রতিক্রিয়াশীলচক্রকে নাড়া দেবে। অতএব সংঘর্ষ অত্যাসন্ন। এ কারণেই দ্বিতীয় বিপ্লবকে—তাঁর উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও কর্মসূচিকে ধরে রাখার প্রয়াসেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক-গবেষক সিদ্দিকুর রহমানের সাথে আলাপ-আলোচনা করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশ্নমালা তৈরি করে বঙ্গবন্ধুর কাছে যেতাম। তিনি উত্তর দিতেন। আমি লিখে রাখতাম।

বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষ্য-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি-বেয়াই মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রণালয়ের সংস্থাপন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, বাকশাল দর্শনের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক, বাকশাল নির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য, ক্যাডার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক এটিএম সৈয়দ হোসেনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ১৯৮২ সালে "বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন" নামক একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। ঐ মূল পান্ডলিপির ভূমিকা লিখে গেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য বোস প্রফেসর ডঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী। আলোচ্য গ্রন্থখানি ঐ মূল পাণ্ডুলিপির ৩য় খন্ড দিয়ে সাজানো হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর সুবিশাল ব্যক্তি ও বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন আজ ইতিহাসের উপাদান। দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যেই তাঁর সামগ্রিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিলো। সেই রাজনৈতিক চিন্তাচেতনাজাত তাঁর পরিকল্পিত নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বেই তাঁকে হত্যা করা হয়। পরিত্যক্ত হয় সেই কর্মসূচি, আজো যা রয়েছে অপ্রকাশিত। বাকশালঃ দ্বিতীয় বিপ্লবঃ শোষিতের গণতন্ত্র কী ও কেন—চলমান ইতিহাসের গতিপথ এ-স্তরে এসেই থমকে যায় যেন! অথচ ঐ অপ্রকাশিত অধ্যায়টি বঙ্গবন্ধুর পবিত্র রক্তের আখরেই মন্ডিত।

বঙ্গবন্ধুর সেই অপ্রকাশিত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ঘটবে কিনা জানি না। ঐ সবই আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মহাকালের ইতিহাসের প্রবহমান গতিপথে তা

সন্নিবেশিত করার দায়িত্ববোধ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের সহৃদয়তার ওপরই এর মূল্যায়নভার ছেড়ে দিলাম।

মূল পাণ্ডুলিপি লিখন-প্রণয়নকার্যে আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে আর যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক পণ্ডিত সাহিত্যিক খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ডঃ মোশাররফ হোসেন, বিশিষ্ট রাজনীতিক মহিউদ্দিন আহমদ, আব্দুস সামাদ আজাদ, জিল্লুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, কর্ণেল শওকত আলী (অবঃ), মোরতাজুর রহমান মর্তুজা, এটিএম নূরুল হোসেন, সাহিত্যিক সিদ্দিকুর রহমান, আইনজীবি মুক্তিযোদ্ধা আবু জাহিদ সেন্টু, সমাজসেবী আবুল কাসেম প্রমুখ সুধিজন। এঁদের কাছে আমি চির ঋণী।

আমার স্ত্রী নিলুফার ইয়াসমিন পাপিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকার্যে যেমন সাহায্য করেছেন তেমনি লিখনকার্যে আমাকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেন। অনিও কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টিং-এর স্বত্বাধিকারী ফাতেমা খায়রুন্নেছা জেবুর সহযোগিতা, স্নেহভাজন কবি আশরাফুজ্জামান, নাজির আলী খান, লস্কর নজরুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম (বুদ্দু ভাই), মোশাররফ হোসেন শিকদার, সৈয়দ আলী, সাইদুর রহমান রাসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের অনুপ্রেরণার কথা আমার মনে থাকবে।

পরিশেষে সুধি পাঠকদের মতামত ও পরামর্শ আহ্বান করছি। ধন্যবাদ।

১ ডিসেম্বর, ১৯৯১ — আবীর আহাদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর একটি বিশেষ সাক্ষাতকার

আবীর আহাদ ঃ বঙ্গবন্ধু, আপনার রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূলনীতি বা লক্ষ্য কি ?

বঙ্গবন্ধু ঃ আমার রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা ধ্যান ও ধারণার উৎস বা মূলনীতিমালা হলো গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই চার মূলনীতিমালার সমন্বিত কার্যপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি শোষণহীন সমাজ তথা আমার দেশের দীন দুখী শোষিত বঞ্চিত শ্রমজীবি মেহনতী মানবগোষ্ঠীর মৌলিক মানবাধিকার ও তাদের সমষ্টিগত প্রকৃত 'গণতান্ত্রিক একনায়কতান্ত্রিক' শাসন প্রতিষ্ঠাকরণই আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারার একমাত্র লক্ষ্য।

আবীর আহাদঃ বঙ্গবন্ধু, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কি একযোগে বা পাশাপাশি চলতে পারে।

বঙ্গবন্ধু ঃ যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তাকে সংখ্যালঘু ধনিক শোষকদের গণতন্ত্র বলাই শ্রেয়। এর সাথে সমাজতন্ত্রের বিরোধ দেখা দেয় বৈকি। তবে 'গণতন্ত্র' চিনতে ও বুঝতে আমরা ভুল করি। কারণও অবশ্য আছে। আর তাহলো শোষকসমাজ গণতন্ত্র পূর্ণভাবে বিকাশলাভ করুক তা চায় না। এবং গণতন্ত্রকে কিভাবে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার হাতিয়ারে পরিণত করা যায়—এখানে চলে তারই উদ্যোগ আয়োজন। এভাবেই প্রকৃত গণতন্ত্রকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। সাধারণ অজ্ঞ জনগণই শুধু নয়—তথাকথিত শিক্ষিত সচেতন মানুষও প্রচলিত আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে সঠিকভাবে বুঝতে অক্ষম। এঁরা ভাবে যে, ভোটাভুটিই হলো গণতন্ত্র। একটু তলিয়ে দেখে না প্রাপ্তবয়স্ক মোট জনসংখ্যার কতো পার্সেন্ট লোক ভোট দিলো, কোন শ্রেণীর লোকেরা নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলো, কারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গেলো, ক্ষমতাসীনরা কোন পদ্ধতিতে তাদের শাসন করছে, সাধারণ জনগণ কতোটুকু কী পাচ্ছে। সুতরাং আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি—প্রচলিত গণতন্ত্রের বদৌলতে সমাজের মাত্র ৫% ভাগ লোকের বা প্রভাবশালী ধনিকশ্রেণীর স্বৈরাচারী শাসন ও বল্গাহীন শোষণকার্য পরিচালনার পথই প্রশস্ত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রচলিত গণতন্ত্রের মারপ্যাচে সমাজের নিম্নতম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শাসন ও প্রভাব প্রতিপত্তি, সর্বপ্রকার দুর্নীতি শোষন অবিচার অত্যাচার ও প্রতারণায় সমাজের সর্ববৃহত্তম অজ্ঞ দুর্বল মেহনতী কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানবগোষ্ঠীর (শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ) মৌলিক মানবাধিকার ও তাদের গণতান্ত্রিক

অধিকার খর্ব হচ্ছে। তারা বঞ্চিত হচ্ছে। 'প্রকৃত গণতন্ত্র' বলতে আমি এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝি, যে ব্যবস্থায় জনগণের বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বৃহত্তর কল্যাণের নিমিত্তে তাদের জন্যে, তাদের দ্বারা এবং তাদের স্বশ্রেণীভুক্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে গঠিত সরকার প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে তাদেরই প্রকৃত শাসন ও আর্থসামাজিক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রচলিত গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্জিত হতে পারে না। কারণ প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে চলে অর্থ সম্পদের অবাধ ও মুক্ত প্রতিযোগিতা। এ ক্ষেত্রে দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এ জাতীয় আর্থপ্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিই এদেরকে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কার্যকরি নিশ্চয়তা দিতে পারে—তাদের আর্থসামজিক মৌলিক মানবাধিকার ও তাদের প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ জন্যে আমি মনে করি প্রকৃত গণতন্ত্রের আরেক নাম সমাজতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যেই প্রকৃত গণতন্ত্র নিহিত। তবে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ হতেই সমাজতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে। এ জন্যেই আমি গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছি। আমি মনে করি প্রকৃত গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ভেতর কোনো বিরোধ নেই।

আবীর আহাদ ঃ বঙ্গবন্ধু, আপনার চার মূলনীতিমালার উৎস কি ? অনেকে বলে থাকেন আপনার গৃহীত চারটি মূলনীতি নাকি পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক বিশ্বের ইতিহাস সভ্যতা ও ঐতিহ্য থেকে উত্থিত। তবে এগুলো আপনার মূলনীতি হয় কী করে—একটু খুলে বলবেন কি ?

বঙ্গবন্ধু ঃ এ জাতীয় প্রশ্নই আমি আশা করেছিলাম। আমার গৃহীত চারটি মূলনীতি ইতিহাস সভ্যতা ও ঐতিহ্যের ফসল বৈকি। এগুলো আমার নিজসৃষ্ট দর্শন নয়। তবে এগুলো পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক বিশ্ব থেকে উত্থিত তা যেমন সত্য নয়—তেমটি ওগুলোর আবিষ্কারক বা সৃষ্টিকর্তা বলতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিমানুষের একক কোনো কৃতিত্বও নেই। নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগুলো সমাজের বুকে উঠে এসেছে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে ব্যক্তির দ্বারাই এ সব তত্ত্ব সমাজে প্রয়োগ হয়ে থাকে সমাজের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে বলে আমি মনে করি। এ প্রেক্ষিতে মরগান থেকে তোমাকে উদ্বৃতি দিচ্ছি ঃ Objective conditions govern the thinking process of man'— অর্থাৎ সমাজের বাস্তব অবস্থাই মানুষের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে থাকে। .... আদিকালে প্রাকৃতিক নৈসর্গিক প্রতিকূল অবস্থা ও বিরাটকায় হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে ক্ষুদ্র দলবদ্ধ মানবগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে সংঘবদ্ধভাবে চলাফেরা, আহার-বিহার ও বসবাস করতে বাধ্য হয়। তৎকালীন

প্রাকৃতিক সামাজিক পরিবেশে একার পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে জীবন নির্বাহ করা একেবারেই সম্ভব ছিলো না। ফলে ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিস্বার্থ বা ব্যক্তিসম্পদের ভোগদখল বা ব্যক্তিলোভ-লালসার কোনো অবকাশ ছিলো না। প্রাকৃতিক পরিবেশগত সামাজিক কারণেই তারা সমষ্টিগত বা যৌথভাবে তাদের প্রাত্যহিক কার্যপ্রণালী সম্পাদন করতো। এই সব প্রাকৃতিক বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে এ সামাজিক স্তরে তাই শ্রেণীসত্তার উদ্ভব ঘটেনি। খাদ্য ও [illegible]ন্যান্য আনুষঙ্গিক জীবননির্বাহের সামগ্রীর পরিমাণ এতোই নগণ্য ছিলো যে, তা দিয়ে জীবন রক্ষাই করা ছিলো দুরুহ। ফলশ্রুতিতে বাড়তি বা উদ্বৃত্তসম্পদ বলতে কিছুই ছিলো না। কারণ ব্যক্তিমালিকানাই (যে ব্যক্তিমালিকানাকে হাতিয়ার করে শোষণের পথ রচিত হয়।) হলো সকল প্রকার দুর্নীতি ও শোষণের প্রধানতম উপায়—সেই ব্যক্তিমালিকানাই ছিলো এ স্তরে অজানা। খাদ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে ও নানান প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেদেরকে নিরাপদে রাখার লক্ষ্যে তারা যাযাবর জীবনযাপন করতো। তাই তাদের নির্দিষ্ট আবাসভূমি বা রাষ্ট্র ছিলো না। এ স্তরে তাদের মনে আল্লাহ বা ধর্ম বলতে কিছুই ছিলো না। অর্থাৎ আদিমকালে মানুষের মধ্যে কোনো শ্রেণী স্তর শোষণ রাষ্ট্র ও ধর্ম ছিলো অজানা, অজ্ঞাত। এই যে সামাজিক স্তর—এটাকেই ইতিহাসে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'আদিম সাম্যবাদী সমাজ' হিশেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কালক্রমে মানবগোষ্ঠী বেঁচে থাকার তাগিদে সীমাহীন কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে নানান কলাকৌশল ও হাতিয়ারের সাহায্যে প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ ও হিংস্র জীবজন্তুকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হতে থাকে এবং খাদ্যসহ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ ও উৎপাদন করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে থাকে। সেই সাথে অবাধ ও মুক্ত প্রেমলীলার ফলে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বাড়তি জনসংখ্যা উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে এ স্তরে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টির পরিবেশ গড়ে ওঠে। এ সামাজিক পরিবেশে বাড়তি সম্পদকে কেন্দ্র করে ও প্রত্যক্ষ রক্তের সম্পর্ককে ভিত্তি করে 'আদিম সাম্যবাদী সমাজ' কালক্রমে 'উপজাতীয় সমাজে' প্রবেশ করে। তবে এ সামাজিক স্তরে আদিম সাম্যবাদী সমাজের সবই গৃহীত হতে দেখা যায়। তবে এ স্তরে তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের উন্মেষ ঘটে। উপজাতীয় পারিবারিক সমাজ পরিচালনার জন্যে উপজাতীয় বয়োজেষ্ঠ্য বা শক্তিশালী বা জ্ঞানীব্যক্তিকে সর্বসম্মতিক্রমে 'উপজাতীয় প্রধান' হিশেবে নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীকালে উপজাতীয় সমাজের বিস্তৃতি ঘটলে উপজাতীয় লাঠিয়াল বাহিনী প্রধান বা সমরপ্রধান, উৎসব প্রধান, শিকার প্রধান, কৃষি প্রধান ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হয়। উপজাতীয় প্রধানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সমাজের প্রতিটি সদস্য -

সদস্যাদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সম-অধিকারের ভিত্তিতে সম্পাদন করা হতো। সকলের আয়-রোজগার 'উপজাতীয় তহবিলে' জমা হতো। এখানেও কেউ কাউকে শোষণ করতে পারতো না—সেই পরিবেশও তখনো পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। যৌথ বা সমষ্টিগত চিন্তায় ছিলো তারা আচ্ছন্ন। কিন্তু কালক্রমে উপজাতীয় প্রধান বা সমরপ্রধান, উৎসব প্রধান ও অন্যান্য শক্তিশালী ব্যক্তিদের মনে উপজাতীয় সমষ্টিগত বাড়তি সম্পদের ভোগ-দখলকে কেন্দ্র করে লোভ-লালসা ও সমাজের বুকে প্রভাব প্রতিপত্তি সংহত করার সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিসম্পদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বীজ অংকুরিত হতে থাকে এবং এভাবেই উপজাতীয় সাম্যবাদী সামাজিক কাঠামোয় প্রচন্ড ধস্ নেমে আসে। কালক্রমে, শক্তিশালী জ্ঞানী বা সমাজ প্রধানদের কৌশল, অত্যাচার, নির্যাতন, ফন্দিফিকির ও প্রতারণার শিকার হয়ে সমাজের বৃহত্তম অজ্ঞ দুর্বল মানবগোষ্ঠী তাদের অধীনে দাস হিশেবে পরিণত হতে থাকে। এভাবেই মানবসমাজ দাস প্রথার যুগে প্রবেশ করে। আর এই দাস প্রথাভিত্তিক সমাজের গর্ভ হতেই অর্থাৎ প্রভূদের কারসাজিতেই মানব সমাজের বুকে প্রত্যক্ষ শ্রেণীসত্তা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা, দুর্নীতি, ইত্যাদি প্রথমবারের মতো আইনসম্মত হয়ে পড়ে এবং এগুলোকে আরো সাংগঠনিক উপায়ে কার্যকরি করার লক্ষ্যে ধর্ম, আইন কানুন, রাষ্ট্র, পুলিশ বা নিরাপত্তা বাহিনী প্রভৃতির উদ্ভব ঘটে। এ জাতীয় অসংগতি, শোষণ, দুর্নীতি, অত্যাচার, নির্যাতন, ব্যভিচার, বৈষম্য, অবিচার, রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার, ধর্মীয় প্রতারণা, কুসংস্কার এবং এর ধারক-বাহক সামন্তবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজের শাসক শোষকগোষ্ঠীর কবল থেকে মানবজাতির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে মহানবী ও মণীষী কালমার্কস সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লবের যে দিকদর্শন ও আহবান প্রদান করে গেছেন, তার মধ্যে নতুন তেমন কিছু নেই—তা আদিম অকৃত্রিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থারই বিবর্তনগত, গুণগত বা কাঠামোগত বৈজ্ঞানিক প্রতিফলন বৈ কিছু নয়। তেমনি আমিও সাম্যবাদের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং আমার দেশের মানুষ ও সমাজের প্রয়োজনে চিন্তাভাবনা করে দেখলাম, সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লব ব্যতীত আমার দেশের সাধারণ মানুষের সার্বিক মুক্তি আসতে পারে না। আর সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্তই হচ্ছে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ—যে চেতনাবোধ বস্তুতঃ নির্ভর করে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব, সাম্যবাদী আর্থসামাজিক পরিবেশ, জনগণের ইস্পাতকঠিন ঐক্য তথা জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিশেবে চিহ্নিত করেছি।

আবীর আহাম্মদঃ অনেকে বলেন, 'বাকশাল' হলো একদলীয় বা আপনার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার একটি অপকৌশল—এ সম্পর্কে আপনি পরিষ্কার মতামত দিন।

বঙ্গবন্ধু ঃ সাম্রাজ্যবাদের অবশেষ পুঁজিবাদী সমাজসভ্যতা ও শোষক পরজীবিদের দৃষ্টিতে 'বাকশাল' তো একদলীয় শাসন ব্যবস্থা হবেই! কারণ বাকশাল কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে আমি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি বহুজাতিক পুঁজিবাদী শোষক, তাদের সংস্থাসমূহের লগ্নিকারবার এবং তাদের এদেশীয় সেবাদাস, এজেন্ট, উঠতি ধনিক গোষ্ঠীর একচেটিয়া শোষণ ও অবৈধ প্রভাবপ্রতিপত্তি-দুর্নীতি-প্রতারণার সকল বিষদাঁত ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করেছি। এ জন্যে তাঁদের আঁতে ঘা লাগছে, বাকশাল ও আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীশক্তি শাসকরা এদেশে গোপনে অর্থ যোগান দিয়ে তাদের সেবাদাস ও এজেন্টদের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রমকে বানচাল করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাঁরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, সভা-সমিতি, এমন কি ধর্মীয় অনুষ্টানের মধ্য দিয়ে আমার সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে। কলকারখানা, অফিস-আদালত, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন থানায় তাদের ভাড়াটিয়া চরদের দিয়ে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালাচ্ছে। বিভিন্নস্থানে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, গণহত্যা, অসামাজিক কার্যকলাপ ও সাম্প্রদায়িক তৎপরতা চালাচ্ছে। প্রতিদিন তাদের ষড়যন্ত্রের খবরা-খবর আমার কানে আসছে। প্রচলিত গণতান্ত্রিক বৈষম্য, শোষণ-দুর্নীতিভিত্তিক সমাজকে, দেউলিয়া আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, জরাজীর্ণ প্রশাসন ও অবিচারমূলক বিচার ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করে একটি শোষণহীন দুর্নীতিহীন বৈষম্যহীন ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লবের পথ রচনা করেছি। এই সমাজ বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী নন, তাঁরাই বাকশাল ব্যবস্থাকে একদলীয় স্বৈরশাসন ব্যবস্থা বলে অপপ্রচার করছেন। কিন্তু আমি এ সকল বিরুদ্ধবাদীদের বলি, এতোকাল তোমরা মুষ্টিমেয় লোক, আমার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ দুখী মেহনতী মানুষকে শাসন ও শোষণ করে আসছে। তোমাদের বল্গাহীন স্বাধীনতা ও সীমাহীন দুর্নীতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার অবাধ ও মুক্ত প্রতিযোগিতার হোলিখেলায় আমার দুখীমানুষের সব আশা-আকাংকা-স্বপ্ন-সাধ ধুলায় মিশে গেছে। দুখী মানুষের ক্ষুধার জ্বালা ব্যথা বেদনা হতাশা ক্রন্দন তোমাদের পাষাণ হৃদয়কে একটুও গলাতে পারেনি। বাংলার যে স্বাধীনতা তোমরা ভোগ করছো, এই স্বাধীনতা, এই দেশ, এই মাটি ঐ আমার দুখী মেহনতী মানুষের সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্দোলন সংগ্রাম এবং জীবন মৃত্যুর বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; সেখানে তোমাদের অবদান কতোটুকু আছে, নিজেদের বুকে একবার হাত দিয়ে চিন্তা করে দেখো। বরং অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছো। বিদেশী শাসক-শোষকদের সহায়তা করেছো। নিজের ঘরে থেকে ভাইয়ের ঘর পুড়িয়েছো, মানুষকে হত্যা করেছো। মা-বোনদের লাঞ্চিতা করেছো, আরো কিনা করেছো? এ সব কিছু করেছো শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের ঘৃণ্য লক্ষ্য। আমার দেশের মাত্র ৫ পার্সেন্ট লোক ৯৫ পার্সেন্ট লোককে দাবিয়ে

রাখছে, শাসন শোষণ করছে। বাকশাল করে আমি ঐ ৯৫% ভাগ মানুষের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক শাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থা করেছি। এতোকাল ৫% ভাগ শাসন করেছে, এখন থেকে করবে ৯৫% ভাগ। ৯৫% ভাগ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে ৫% ভাগকে মিশতে হবে। আমি মেশাবোই। এ জন্যে বাকশাল করেছি। এই ৯৫% ভাগ মানুষকে সংঘবদ্ধ করেছি তাদের পেশার নামে, তাদের বৃহত্তর কল্যাণে, তাদের একক দল 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশালে। সুতরাং মূলতঃ বাকশাল হচ্ছে বাঙ্গালীর সর্বশ্রেণী সর্বস্তরের গণমানুষের একক জাতীয় প্লাটফরম, রাজনৈতিক সংস্থা, একদল নয়। এখানে স্বৈরশাসনেরও কোনো সুযোগ নেই। কারণ বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত বা সমষ্টিগত শাসন ব্যবস্থায় কে কার ওপর স্বৈরশাসন চালাবে ? প্রত্যেক পেশার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে শাসন পরিষদ গঠিত হবে। কোনো পেশা বা শ্রেণী অন্য পেশার লোকদের ওপর খবরদারী করতে পারবে না। যে কেউ যিনি জনগণের সার্বিক কল্যাণের রাজনীতিতে, জাতীয় সমৃদ্ধির ও উৎপাদনের রাজনীতিতে তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার রাজনীতিতে বিশ্বাসী, তিনি এই জাতীয় দলে ভিড়তে পারবেন। যাঁরা বাকশালকে একদলীয় ব্যবস্থা বলেন, তাঁদের স্মরণ করতে বলি, ইসলামে ক'টি দল ছিলো ? ইসলামী ব্যবস্থায় একটি মাত্র দলের অস্তিত্ব ছিলো, আর তা হলো 'খেলাফত' তথা খেলাফতে রাশেদীন। মার্কসবাদও একটি মাত্র দলের অনুমোদন দিয়েছে। চীন রাশিয়া কিউবা ভিয়েতনাম ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রে কতটি করে দল আছে ? সৌদি আরব ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রে কতটি করে দল আছে ? এই সব ইসলামী রাষ্ট্রসমূহকে বাদ দাও, ওখানে মহানবীর ইসলাম নেই। বস্তুতঃ প্রকৃত গণতন্ত্র বা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই একটি একক জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থা থাকা বাঞ্চনীয়। একটি জাতীয় কল্যাণের অভীন্ন আদর্শে, ব্যাপক মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে একটি মাত্র রাজনৈতিক সংস্থার পতাকাতলে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু বহুদলীয় তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় কোনোভাবেই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়। প্রকৃত গণতন্ত্র, জনগণের গণতন্ত্র, কল্যাণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়; সেখানে বহুদলে জনগণ বহুধা বিভক্ত হতে বাধ্য। আর বিচ্ছিন্ন বিভক্ত পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের দ্বন্দ্বসংঘাত হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানির রাজনীতি দিয়ে জাতির বৃহত্তর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কোনোভাবেই অর্জিত হতে পারে না। ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয় না। আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও তাই বলে।

আবীর আহাদ : বঙ্গবন্ধু, বাকশালের মূল লক্ষ্য বা এর কর্মসূচী সম্পর্কে কিছু বলুন।

বঙ্গবন্ধু : বাকশালের মূল লক্ষ্য তো আগেই বিশ্লেষণ করেছি। তবে এক

কথায় আমি যা বুঝি তাহলোঃ একটি শোষণহীন দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ও শোষিতের গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠাকরণ। বাকশাল কর্মসূচীকে আমি প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করেছি। এক: রাজনৈতিক, দুই: আর্থসামাজিক, তিন: প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা।

এক: রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক পেশাভিত্তিক লোকদের জাতীয় দল 'বাকশালে' অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা রেখেছি। এবং পর্যায়ক্রমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রত্যেকটি নির্বাচনী এলাকায় জাতীয় দলের একাধিক প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়া হবে। জনগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত করবেন। প্রেসিডেন্ট জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। জাতীয় দলের সদস্য যে কেউ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে জাতীয় দলের চেয়ারম্যান হবেন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদের আস্থাভাজন একজনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন। সংসদ সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের অনাস্থায় প্রেসিডেন্টকে অপসারিত করতে পারবেন। মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী থাকবেন। স্থানীয় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সর্বস্তরে জনগণের প্রতিনিধিত্ব প্রত্যক্ষভাবে বজায় থাকবে ....

দুই: আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম-সমবায় প্রকল্প। এর মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থব্যবস্থার উন্নয়ন বা স্বনির্ভর-স্বাধীন গ্রামীণ ব্যবস্থা, বিশেষ করে ভূমিসংস্কারের প্রয়োজনীয় ও কার্যকরি ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের পূণর্বাসন তথা কৃষকদের হাতে জমি হস্তান্তর, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সাম্যভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। ভারী শিল্প-কলকারখানা, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাংক, বীমা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি জাতীয়করণ করে জনগণের যৌথ শেয়ার মূলধনে নতুন নতুন কৃষিজাত শিল্প ও অন্যান্য শিল্প কলকারখানা ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা। সীমিত ব্যক্তিমালিকানাকে উৎসাহদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাসমূহ যাতে জনসাধারণ ও তাদের শ্রমিকদের শোষণ করতে না পারে তার ব্যবস্থা থাকবে

তিন: প্রশাসনিক কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, করপোরেশন ও বিভাগগুলোর পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন তথা মাথাভারী প্রশাসনের উচ্ছেদ সাধন। .... প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 'জেলা গভর্নর' ও 'থানা প্রশাসনিক প্রকল্প' হাতে নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশের সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়েছে। প্রশাসনিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ইউনিয়ন পরিষদ, মহকুমা ও বিভাগীয় প্রশাসনকে তুলে দেয়া হচ্ছে। জেলা ও থানাগুলো জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হবে। গ্রাম সমবায় পরিষদ সদস্যদের ভোটে থানা পরিষদ গঠিত

হবে। তবে থানা পরিষদের প্রশাসক/ চেয়ারম্যান ও জেলা গভর্নর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। থানা প্রশাসক/ চেয়ারম্যানরা এবং জেলা গভর্নররা জনগণ, স্ব-স্ব পরিষদ ও প্রেসিডেন্টের কাছে দায়ী থাকবেন। সরকারি কর্মচারীরা থানা প্রশাসক/ চেয়ারম্যান এবং জেলা গভর্নরদের নিকট দায়ী থাকবেন। গ্রাম সমবায় পরিষদ থানা পরিষদের কাছে, থানা পরিষদ জেলা পরিষদের কাছে দায়ী থাকবে। গ্রাম সমবায় পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ—এরপরেই থাকবে জাতীয় সরকার। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে জাতীয় সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে বিপুলভাবে বিকেন্দ্রিকরণ করে প্রশাসনকে জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি। প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র, ষ্টিলফ্রেম গতানুগতিক বা টাইপ্ড চরিত্রকে ভেঙ্গে গুড়ো করে দেবার ব্যবস্থা নিয়েছি। সরকারি কর্মচারিরা এখন থেকে জনগণের সেবক।

বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টকে রাজধানীতে বহাল রেখে হাইকোর্ট বিভাগকে আটটি আঞ্চলিক বিভাগে বিকেন্দ্রিকরণের ব্যবস্থা নিয়েছি। তবে সুপ্রিম কোর্টের অধিবেশন বছরে অন্ততঃ একবার করে প্রতিটি আঞ্চলিক বিভাগে (হাইকোর্ট বিভাগে) বসবে। জেলা আদালতসমূহ বহাল থাকবে। প্রতিটি থানাতে থাকবে একাধিক বিশেষ ট্রাইবুনাল। প্রত্যেক আদালতে যেকোনো মামলা ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে মীমাংসা করতে হবে। গ্রামে থাকবে একাধিক 'শালিস বোর্ড। 'শালিস বোর্ড' গঠিত হবে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক ও গন্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে। শালিস বোর্ড চেয়ারম্যান থাকবেন সরকার নিয়োজিত বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটরা। এভাবে সুষ্ঠু, ন্যায় ও দ্রুততর গণমুখি বিচারকার্য সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে।

আবীর আহাদঃ বঙ্গবন্ধু, অনেকে বলেন, আপনি নাকি কোন একটি শক্তির চাপের মুখে বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাকশাল কর্মসূচী দিয়েছেন এবং এ ব্যবস্থা নাকি সাময়িককালের জন্যে করেছেন—এ বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ করে কিছু বলবেন কি ?

বঙ্গবন্ধু ঃ কারো প্রেসার বা প্রভাবের নিকট আত্মসমর্পণ বা মাথা নত করার অভ্যাস বা মানসিকতা আমার নেই। এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁরাও তা ভালো করেই জানেন। তবে, অপপ্রচার করে বেড়াবার বিরুদ্ধে কোনো আইন নেই, তাই উনারা এ কাজে আদাজল খেয়ে নেমেছেন। করুন অপপ্রচার। আমি স্বজ্ঞানে বিচার-বিশ্লেষণ করে, আমার অভিজ্ঞতার আলোকে, আমার দীনদুখি মেহনতী মানুষের আশা-আকাংখা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে আমি বাকশাল কর্মসূচী দিয়েছি। আমি যা বলি, তা-ই করে ছাড়ি। যেখানে একবার হাত দেই সেখান থেকে হাত উঠাই না। বলেছিলাম, এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো, মুক্ত করেছি। বলেছি, শোষণহীন

দুর্নীতিমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলা গড়বো, তা-ই করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ্। কোনো কিন্তু-টিন্তু নাই, কোনোই আপোষ নাই।

আবীর আহাদ ঃ বঙ্গবন্ধু, বাকশাল বিরোধীমহল অর্থাৎ ঐ ৫% জন, ওরা সংখ্যায় অতি নগণ্য হলেও তাদেরই হাতে রয়েছে বিপুল সম্পদ। তাদের সাথে রয়েছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী শক্তির যোগসাজশ। তাদের পেইড এজেন্টরাই রয়েছে প্রশাসনিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার কেন্দ্রে। তাদের কায়েমী স্বার্থের ওপর আপনি আঘাত হানতে যাচ্ছেন, এ অবস্থায় তারা চোখ মেলে মুখ গুজে বসে থাকবে বলে কি আপনি মনে করেন ? তারা তাদের অবস্থান নিরাপদ ও সংহত করার জন্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে না ?

বঙ্গবন্ধু ঃ আমি জানি তারা বসে নাই। ষড়যন্ত্র চলছে। প্রতিদিনই ষড়যন্ত্রের উড়ো খবর আমার কাছে আসে। সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহীরা এসব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। গোপন পথে অঢেল অর্থ এ কাজে লাগাবার জন্যে বাংলাদেশে আসছে। সুকৌশলে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চলছে। অপপ্রচার চলছে। আমি জাতির বৃহত্তর কল্যাণে এ পথে নেমেছি। জনগণ সমর্থন দিচ্ছে। তাই ষড়যন্ত্র করে, বাধার সৃষ্টি করে, হুমকী দিয়ে আমাকে নিবৃত করা যাবে না। আমার কাজ আমি করে যাবোই। হয়তো শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে মেরে ফেলতে পারে। পরোয়া করি না। ও মৃত্যু আমার জীবনে অনেকবার এসেছে। এ্যাক্সিডেন্টলি আজো আমি বেঁচে আছি। অবশ্যই আমাকে মরতে হবে। তাই মৃত্যু ভয় আমার নেই। জনগণ যদি বোঝে আমার আইডিয়া ভালো, তাহলে তারা তা গ্রহণ করবে। আমার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে। আমার একটা বড়ো সান্ত্বনা আছে, যুদ্ধের সময় আমি জনগণের সাথে থাকতে পারিনি। জনগণ আমারই আদেশ ও নির্দেশে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। আজকের এই শোষণমুক্ত সমাজতন্ত্র বা অর্থনৈতিক মুক্তির বিপ্লবে আমি যদি নাও থাকি, তাহলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমার বাঙ্গালীরা যে কোনো মূল্যে আমার রেখে যাওয়া আদর্শ ও লক্ষ্য একদিন বাংলার বুকে বাস্তবায়িত করে ছাড়বে, ইনশাল্লাহ। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু থেকে তোমাকে উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ "উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান—ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" ধন্যবাদ।

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রীয় চার মৌলনীতি

বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদীর্ঘ সুমহান রাজনৈতিক জীবনের চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা, আদর্শ ও লক্ষ্য তাঁর গৃহীত রাষ্ট্রীয় চার মৌলনীতিমালার মধ্যে প্রোতিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চার মৌলনীতিমালা সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, প্রশাসনিক, বিচার ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক দিকদর্শন, গতিপ্রকৃতি ও কর্মসূচি। কোন কোন চিন্তাবিদ এই চার নীতিমালার সমন্বিত চিন্তাদর্শনকে 'মুজিববাদ' বলে অভিহিত করেছেন। এই চার নীতিমালার আদর্শ ও লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, উজ্জীবিত হয়ে বাঙ্গালী জাতি এক সর্বোচ্চ ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে পাকিস্তানী শাসন শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণ প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত করেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্র হলো বাঙ্গালীর ব্যাপক গণমানুষের রাজনৈতিক জীবনবোধের চাবিকাঠি; সমাজতন্ত্র হলো আর্থবৈষয়িক সাম্যতার ভিত্তিতে সকল মানুষের মৌলিক মানবাধিকার ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত হাতিয়ার এবং জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা হলো বাঙ্গালীর জাতীয় ঐক্য সাম্য মৈত্রী সম্প্রীতি সহমর্মিতা ভ্রাতৃত্ব সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ভালোবাসা প্রতিষ্ঠার উজ্জীবনিশক্তি।

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল বা দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির ভিত্তিও হলো এ চার মৌলনীতিমালা। এখানে চার মৌলনীতিমালাকে কার্যকরভাবে সুসংহত ও সুসংরক্ষিত করা হয়েছে। শোষণহীন গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উক্ত চার মৌলনীতিমালার বিকল্প কোন দার্শনিক বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। নিম্নে বঙ্গবন্ধুর চার রাষ্ট্রীয় মৌলনীতিমালার ওপর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দেয়া হলো।

ক. গণতন্ত্র

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিলো প্রাচীন গ্রীসের এথেন্সনগরীতে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে। গ্রীক নগররাষ্ট্রের (কোন একটির) কর্ণধার বা চিন্তাবিদ; নামে খ্যাত সোলন সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপকাঠামোর রীতিনীতির প্রচলন করেন। সোলনের আবির্ভাবের প্রায় একশত বছর পরে কেলিস্থিনিস এবং তৎপরবর্তীতে থেসিয়াস শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে নগররাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থা আইনানুগ স্বীকৃতি লাভ করে।

গ্রীস পরিভাষা 'Demos' (জনগণ) ও 'Kratos' (ক্ষমতা) থেকেই 'Democracy' বা গণতন্ত্র শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। সাধারণার্থে—যে ব্যবস্থায় জনগণের ক্ষমতা স্বীকৃত বা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকেই 'গণতন্ত্র' বলা হয়। কিন্তু গ্রীস নগররাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রকৃতার্থে গণতন্ত্র বলা যায় না। নগররাষ্ট্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই ঐ গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করতো। 'জনগণ' বলতে যে সমাজের সর্বস্তরের সম্মিলিত মানবগোষ্ঠীকে বুঝায়, সেই জনগণের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কোনোই ব্যবস্থা সেখানে ছিলো না। তৎকালীন সমাজের জনগণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সমাজের দাস—ভূমিদাস বা দাসশ্রমিক তথা সর্বহারা জনসাধারণের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া বা ভোটপ্রদান করা বা শাসন পরিষদে কোনোভাবে অংশগ্রহণ করার কোনোই অধিকার ছিলো না। নগররাষ্ট্রের রাজা বা কর্ণধাররা উত্তরাধিকারভিত্তিক শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতেন। নগররাষ্ট্রের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রাজার অধীনে একটি নির্বাচিত পরিষদ গঠন করা হতো। এ পরিষদে সমাজের সামন্তপ্রভূ, সম্ভ্রান্ত কৃষক, জোতদার, পুরোহিত ও অন্যান্য প্রভাবশালীগোষ্ঠীর লোকেরাই কেবলমাত্র নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া ও ভোটপ্রদানের অধিকার পেতো। সুতরাং নগররাষ্ট্রের 'গণতন্ত্র' গণতান্ত্রিক নীতিমালার আলোকে গণতন্ত্রই নয়। এটাকে সংখ্যালঘু প্রভাবশালী শরীফসম্প্রদায়ের গণতন্ত্র বা রাজার রাজতান্ত্রিক 'গণতন্ত্র' বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এটাকে আবার আরেকার্থে 'সামরিক গণতন্ত্র' বলা যেতে পারে। ঐ রাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রচলন বর্তমানেও মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রে দেখতে পাওয়া যায়।

'প্রকৃত গণতন্ত্র' বলতে আমরা কী বুঝি ?

বিভিন্ন রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক দৃষ্টিতে বিভিন্ন চিন্তাবিদ মণীষী গণতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা মতবাদ বা সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে এ সংজ্ঞাটাতেই গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য বা দিকদর্শন বা বিশ্লেষণ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যথাঃ যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বৃহত্তর রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কল্যাণের নিমিত্তে তাদের জন্যে, তাদের দ্বারা, তাদের দিয়ে গঠিত সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের শাসন ও মৌলিক-মানবাধিকার নিশ্চিত হয়, সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই 'প্রকৃত গণতন্ত্র' বলা যায়। এ ব্যবস্থা ব্যতীত গণতন্ত্রের প্রকৃতই আর কোন সংজ্ঞা আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। এক কথায়, যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতা ও তাদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত হয়, সেই শাসন ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্র বলা হয়ে থাকে। আব্রাহাম লিংকনের মতবাদের মধ্যেও গণতন্ত্রের প্রতিফলন ঘটেছে, অপরদিকে

মার্কস-লেনিনের মতবাদের মধ্যে তথা সাম্যবাদের মধ্যে গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে বলে বঙ্গবন্ধু মনে করতেন। এ কারণেই তিনি বাকশাল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদের অনুপ্রেরণায় প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে, সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতিকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে ঐক্যবদ্ধ করে একটি অকৃত্রিম বা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবনপণ সংগ্রাম করেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক মৌলনীতিমালায় গণতন্ত্রকে সর্বাগ্রে অন্যতম প্রধান দিকদর্শন হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন।

আমাদের দেশে, তথা উন্নত বা উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশে রাজনীতির দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, পঞ্চদশ শতাব্দির শেষধাপে বৃটিশের সামন্তবাদী রাজতান্ত্রিক শক্তি ও বাণিজ্যিক পুঁজিবাদী শক্তির মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সংঘর্ষের অনিবার্য পরিণতিতে তৎকালীন সামন্তবাদী বৃটিশ রাজার মুন্ডুপাতের মধ্য দিয়ে ও তাদের পরাভূত করে বাণিজ্যিক পুঁজিবাদী শক্তি রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় ক্রোমওয়েলের নেতৃত্বে। এই বাণিজ্যিক পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর শাসকরা অতঃপর বৃটেনের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল ও বাণিজ্য-শিল্পসমৃদ্ধ নগরী ওয়েস্টমিনিস্টারে সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে পুঁজিবাদী ধনিকশ্রেণীর শাসন ব্যবস্থা তথা গণতন্ত্র প্রবর্তন করে। যে ব্যবস্থা বা পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতিনিধি বা জনগণের প্রতিনিধি বা পার্লামেন্ট নির্বাচনের কার্যপ্রণালী গ্রহণ করা হয়, তাতে প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্র ও তৎকালীন অধুনালুপ্ত সামন্তবাদী রাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আকৃতিগত বিবর্তন ব্যতীত গুণগত কোন পরিবর্তন এই ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচের গণতন্ত্রে প্রতিফলিত হয়নি। নগররাষ্ট্রের রাজা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এবং সাবেক সামন্তবাদী রাজতান্ত্রিক সমাজের রাজপরিবারবর্গ, রাজন্যবর্গ, সামন্তপ্রভূ, জমিদার, লর্ড ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মতোই এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনিক পুঁজিপতি-বাণিজ্যিক বুর্জোয়াগোষ্ঠীর একচেটিয়া শাসন-শোষণকার্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সংহত ও সংরক্ষণ করা হয়। অর্থাৎ সাবেক সমাজের মতো এ সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীস্বার্থকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাকেই এ গণতন্ত্রের মাধ্যমেও পাকাপোক্ত করা হয়।

সেই থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত নানান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই গণতন্ত্রের আকৃতিগত ও গুণগত রূপ বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে প্রচলিত হয়ে আসছে। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'পুঁজিবাদী গণতন্ত্র' বলা হয়েছে। আবার এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদী-সামরিক গণতন্ত্রকেও আমরা প্রত্যক্ষ করে আসছি। যেমন ঃ দক্ষিণ

কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, বার্মা, সিংগাপুর, বাংলাদেশ (১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে), পাকিস্তান, নেপাল, ইরাক, তুরস্ক, জর্ডান, মরক্কো, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার প্রভৃতি আফ্রো-এশিয়া এবং ইয়োরো-ল্যাটিন আমেরিকার রাজতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী সামরিক শাসনযুক্ত রাষ্ট্রসমূহও। প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমাজের ধনিক-বণিক-শিল্পপতি বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর শাসন শোষণ প্রভাব প্রতিপত্তি। গণতন্ত্রের বর্তমান অন্যতম পীঠস্থান নামে খ্যাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে মার্কিন ধনিক-বণিক-শিল্পপতি-পুঁজিপতি পেন্টাগণ ও সামরিক শিল্প-কমপ্লেক্স (Military Industrial Complex)-এর প্রবল প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে। আর অন্যান্য তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশের অবস্থার কথা না-ই বা বললাম। মোট কথা বিশ্বের যে সকল রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক বলে স্বীকৃত বা প্রতিষ্ঠিত সেই রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে সংখ্যালঘু ধনিকশ্রেণীর মাধ্যমে। সুতরাং বিশ্বে বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্রকে প্রকৃতার্থে গণতন্ত্র বলা যায় না। অর্থাৎ পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যেই প্রকৃত গণতন্ত্র নিহিত।

পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সমাজে গণতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে কেবলমাত্র নির্বাচনানুষ্ঠানের মধ্যে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বিপুল অর্থের ছড়াছড়িতে। ফলে মুষ্টিমেয় ধনিক ভাগ্যবান ব্যতীত সমাজের বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মেহনতী মানবগোষ্ঠী নির্বাচনপ্রার্থী হিসেবে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে না। দরিদ্র-মেহনতী মানবগোষ্ঠী শুধু পারে ভোট দিতে এবং তাদের ভোটগুলোও প্রভাবশালী ধনিক প্রার্থীর পক্ষে গিয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ভোট আগে থেকেই শক্তিশালী প্রার্থীর ভোটবাক্সে জমা হয়ে যায় কিন্তু তাদের করার কিছুই থাকে না। এই হলো প্রচলিত গণতন্ত্রের বাস্তবসত্য রূপ। এ গণতন্ত্রই আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকারভিত্তিতে বৃটিশের কাছ থেকে। পুঁজিবাদী বা ধণতান্ত্রিক বিশ্বে এ জাতীয় গণতন্ত্রই একটি আদর্শনীয় ব্যবস্থা বলে স্বীকৃত হয়েছে।

পাকিস্তানের ২৫ বছরের শাসনামলে—এমন কি ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের পর থেকে এখনো পর্যন্ত আমরা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের আরেক রূপ সামরিক গণতন্ত্রকে দেখেছি এবং দেখছি। সামরিক আইন-বিধি বহাল রেখে নামমাত্র ঘোষণার মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে বা সামরিক আইনবিধিকে বেসামরিক বিধিতে রূপান্তরিত করে (প্রকারান্তরে সামরিক আইনের ছত্রছায়ায়) 'মৌলিক গণতন্ত্র', তথাকথিত প্রেসিডেন্ট ও সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে টাউট বাটপাড়ির গণতন্ত্রের নামে ধনিক আমলা, সামরিক আমলা তথা

বুর্জোয়াগোষ্ঠীর শাসন শোষণ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। এ জাতীয় ব্যবস্থাকে চালু করেছেন পাকিস্তানের রাজনীতিতে ইস্কান্দার মির্জা, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে মোশতাক-জিয়া-এরশাদ। অর্থাৎ যতোকাল পুঁজিবাদ বা ধনতান্ত্রিক সমাজ বহাল থাকবে, ততোকাল সামরিক গণতন্ত্র বা বুর্জোয়া গণতন্ত্র বহাল থাকবে।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ, এমন কি তথাকথিত শিক্ষিত মানুষও গণতন্ত্র বলতে কেবলমাত্র নির্বাচন বা ভোটাভুটিকেই বুঝে থাকেন। তারা প্রচলিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে হাবুডুবু খান, কিন্তু মূলত 'প্রকৃত গণতন্ত্র' কী তা তারা বুঝতে সুযোগ পান না বা বুঝতে চেষ্টাও করেন না। শুধুমাত্র ভোটাভুটিই যে গণতন্ত্র নয় তা তারা তলিয়েও দেখেন না।

স্বাধীন বাংলাদেশে বা তারও পূর্বে এ দেশে যে ক'টি সাধারণ নির্বাচন হয়েছে বা যে পদ্ধতিতে বর্তমানে দেশ পরিচালিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে 'প্রকৃত গণতন্ত্র' একেবারেই অনুপস্থিত। সাধারণ নির্বাচনে কোন একটি রাজনৈতিক দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করলে বা নির্বাচনে জয়ী হলেই যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো এমনটি ভাবা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভেবে দেখতে হবে মোট জনসংখ্যার বা আসন লাভকারী রাজনৈতিক দলটি মোট প্রদত্ত ভোটের কতো পার্সেন্ট ভোট পেলো। ধরা যাক, দেশের মোট ভোটারের ৭০% ভাগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো। এই ৭০% ভাগ ভোট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ১৫/২০ রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভক্ত হলো এবং বিজয়ী দলটি দেখা গেলো ঐ ৭০% ভাগ ভোটের মধ্যে এককভাবে ৩০% ভাগ ভোট পেয়েছে এবং দলটি সরকার গঠন করেছে। সুতরাং নির্বাচনে বিজয়ী দলটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে সরকার গঠন করতে সমর্থ হলেও তাকে গণতন্ত্রের বিজয় বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো বলে চালিয়ে দেয়া যায় না। দেখা যাচ্ছে যে মোট ভোটারের ৩০% ভাগ অনুপস্থিত, ৭০% ভাগের মধ্যে ৪০% ভাগের সমর্থনও নেই, অথচ ৭০% ভাগের মধ্যে ৩০% ভাগ ভোট পেয়ে বিজয়ী দলটি যে সরকার গঠন করলো সেই সরকার সংখ্যালঘু জনগণের সরকার—বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন সেই সরকারের পেছনে নেই। সুতরাং এখানে গণমানুষের প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিফলিত হয়নি। এ ব্যতীত দেখতে হবে, সরকারী নীতিতে কোন শ্রেণীর কল্যাণ হচ্ছে। যদি দেখা যায় যে সরকারী নীতির বদৌলতে মুষ্টিমেয় মানুষ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে, আর ব্যাপক জনগণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে, তাহলে সেই সরকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট সরকার হলেও সেটাকে গণতান্ত্রিক (ব্যাপক জনগণের শাসন) ব্যবস্থা বলা যায় না। সুতরাং প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে সংখ্যালঘুদের গণতন্ত্র বা শাসন ব্যবস্থায় সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষ ধনে-সম্পদে,

বিত্ত-বৈভবে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ফুলেফেঁপে উঠছে আর তাদের স্বাধীন যথেচ্ছাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার কার্যকলাপের যজ্ঞে বলি হচ্ছে, শাসিত শোষিত হচ্ছে সমাজের বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবগোষ্ঠী।

এই গণতন্ত্র, সংখ্যালঘুদের গণতন্ত্র, শোষকের গণতন্ত্র, শোষন বঞ্চনা অত্যাচার প্রতারণা ও দারিদ্র্যতা সৃষ্টির গণতন্ত্র তথা পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র—এই তথাকথিত গণতন্ত্রের জন্যে ৩০ লক্ষ বাঙ্গালী রক্ত দেয়নি, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি। এই দেশ মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী বর্ণচোরা, শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধনিক পুঁজিপতি এবং উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন মধ্যস্বত্বভোগী ভাগ্যবানদের দেশ নয়, এই দেশ কোটি কোটি অন্নহীন, বস্ত্রহীন, দীনদুখী, শ্রমজীবি, মেহনতী মানুষেরও দেশ; তাদেরই সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষায় অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ। তাদেরও এদেশে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত পুঁজিবাদী বা শোষণবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জাতাকলে পিষ্ঠ হয়ে তাদের বৃহত্তর গণমানুষের মৌলিক মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছে। এই তথাকথিত গণতন্ত্রের ইতিহাস-ইতিহ্য, রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থা ও নৈতিকতার বাস্তব অবস্থা-তাৎপর্য সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করেই বঙ্গবন্ধু প্রচলিত গণতন্ত্রের জট ভেঙ্গে দিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটাতে সচেষ্ট হন, যে গণতন্ত্র হবে সমাজের বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের তথা ৯৫% ভাগ জনগণের গণতন্ত্র—'শোষিতের গণতন্ত্র'—যে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ব্যাপক জনগণের শাসন ও তাদের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত হয়। তবে প্রশ্ন আসবে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেনো বঙ্গবন্ধু অনেকগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন ? এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রচলিত গণতন্ত্রেরও উত্তরণ বা নির্বাচন তথা সাধারণ নির্বাচনও গত কয়েক যুগের মধ্যে বাঙ্গালীর জীবনে আসেনি এবং এ ব্যতীত জনসাধারণ নির্বাচনকেই গণতন্ত্র বলে ভাবতে অভ্যস্থ ছিলো বা নির্বাচনের প্রতি তাদের টান ছিলো অপরিসীম। ফলে এ কারণেই বঙ্গবন্ধুও সাধারণ নির্বাচন তথা প্রচলিত গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে জনগণকে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, এ গণতন্ত্রের মাধ্যমে তারা কী পেয়েছে বা পেতে পারে। তাই তিনি প্রচলিত গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েই অকৃত্রিম গণতন্ত্রের সঠিক উত্তরণের লক্ষ্যে এবং সেই লক্ষ্যের সোপান সৃষ্টি করে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল পদ্ধতির উদ্ভব ঘটিয়ে ছিলেন। বাকশালের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার মধ্য প্রকৃত গণতন্ত্র, শোষিতের গণতন্ত্র তথা ব্যাপক জনগণের 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করেছিলেন। এ লক্ষ্যে যাবতীয় প্রশাসনিক কেন্দ্রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রশাসনকে গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে বিকেন্দ্রিকরণ করে জনগণের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকশাল আলোচনাকালে এ বিষয়ে বিশদালোচনা করা হয়েছে।

খ. সমাজতন্ত্র

সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ এমন একটা রাজনৈতিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা যেখানে সমাজের ব্যাপক মানুষের প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ ও সম্পদের মালিক সমাজের সমষ্টিগত গণমানুষ; যেখানে শোষণের কোনো অবকাশ নেই, মানুষের মধ্যে কোনো শ্রেণী বা স্তর নেই, সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় পক্ষপাত নেই, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ একই পরিবারভূক্ত। প্রতিটি মানুষ তার প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করবে যোগ্যতার ভিত্তিতে, অর্থের বা অন্য কোনো প্রতিপত্তির ভিত্তিতে নয়। প্রত্যেক মানুষ তার জন্মাধিকারের ভিত্তিতে যাবতীয় রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করবে। প্রত্যেক কর্মক্ষম মানুষ তার যোগ্যতা বা সামর্থনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ও উৎপাদনকার্যে শ্রম বিনিয়োগ করবে এবং প্রত্যেক মানুষ তার প্রয়োজনানুযায়ী সম্পদসামগ্রী বা শ্রমমূল্য তথা প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার ভোগ করবে। অর্থাৎ প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী ব্যবস্থার দিকনির্দেশ রচনা করে বা সমাজতন্ত্র বা সাম্যাবাদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

এক কথায়ঃ সংকীর্ণ ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিচিন্তা, ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিসম্পদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিক্ষমতার স্থলে সমাজের সমষ্ঠিগত মানবগোষ্ঠির স্বার্থ, আর্থিক উন্নতি, গণতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতা, স্বাধীনতা কল্যাণ-সমৃদ্ধি অর্জণের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা যে ব্যবস্থায় নিশ্চিত ও সংহৃত হয় সেই ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ ব্যবস্থা বলা হয়। এর অর্থ এই নয় যে, কোনো মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি বা স্বাধীনতা থাকবে না। প্রত্যেক মানুষ যোগ্যতার ভিত্তিতে অর্জিত সম্পত্তির উপর তার নিজের মালিকানা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার পাবে এবং তার প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা সে ভোগ করবে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী সমাজে নিজস্ব সম্পত্তি বা ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার নেই এ কথা সত্য নয়। একটা মানুষ যদি তার যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজ পায়, প্রয়োজনানুপাতে তার যাবতীয় মৌলিক অধিকার পায় এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ক্ষমতায় বা সাম্যবাদী দর্শনের ভিত্তিতে যাবতীয় রাজনৈতিক স্তরে নিজের মতামত প্রদানের স্বাধীনতা পায় বা প্রতিভা বিকাশের স্বাধীনতা পায় তাহলে সেই মানুষের জীবনে আর কী চাই ? সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ মানুষের এ অধিকারসমূহকে নিশ্চিত ও সুসংহৃত করে। তবে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ কোনো 'ডগমা' নয়। এ ব্যবস্থা দেশ-কাল-সমাজভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব ইয়োরোপীয়, চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক সমাজে যেমন সমাজতন্ত্র একই পদ্ধতিতে

বা নিয়মে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ভৌগোলিক-সামাজিক-আর্থিক ও মানুষের মানসজাত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

বাঙ্গালী জাতির আশা-আকাংখা, মনমানসিকতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে বঙ্গবন্ধু এখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকদর্শন প্রদান করেছেন। এখানে মানুষের ওপর মানুষের শোষণের কালোহাত ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে ধাপে-ধাপে উৎপাদন উপকরণ বা উৎপাদন সম্পর্ক সমাজীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে, শোষণের প্রধানতম হাতিয়ার ভূমিব্যবস্থাকে সংস্কার করার পরিকল্পনা হিসেবে পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা জমি রাখার সিলিং বেঁধে দেয়া হয়েছে, উদ্বৃত্ত বা খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে জমির সিলিং আরো কমিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তারপর এমন একটা পর্যায়ে আসতো যখন ভূমিব্যবস্থা জাতীয়করণ করে সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হবে। এর পূর্বে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিকে বৃহ্য-ক্ষুদ্র খামারের অধীনে ন্যস্ত করে সমবায়ভিত্তিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা হতো। এ ব্যতীত শোষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বৃহৎ শিল্পকলকারখানা, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বা যাবতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাংক বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পাট-চামড়া-চা ও অন্যান্য সম্পদ জাতীয়করণ করা হয়েছে। এখানে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব হঠাৎ করে বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর নয় বিধায় সীমিত ব্যক্তিমালিকানা খাতকে বহাল রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তিমালিকানা খাতে শোষণের কোন সুযোগ নেই বা শোষণকার্য যাতে চলতে না পারে তার জন্যে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মূলতঃ রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মতো আর্থ-বৈষয়িক বা মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাম্যতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা প্রদান করেছেন, এ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁর নিজস্ব চিন্তাচেতনার ফসল— আমদানীকৃত নয়।

গ. জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ এমন একটা ব্যাপক গণচেতনার উজ্জীবনশক্তি বা আদর্শ যাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙ্গালী জাতি সীমাহীন আত্মত্যাগ রক্ত জীবন-মৃত্যু-দুঃখবেদনা শোকসন্তাপ-কষ্ট-অত্যাচার-নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করে জাতীয় স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একটি সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে হানাদার বর্বর পাকবাহিনী ও তাদের প্রভূশক্তিসমূহকে পরাভূত করে মাতৃভুমিকে মুক্ত করে এনেছে। আর সেই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রাম তথা একটি শোষণহীন

সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারে বলেই বঙ্গবন্ধু তাঁর চার রাষ্ট্রীয় মৌলনীতিমালার মধ্যে জাতীয়তাবাদকে স্থান দিয়েছেন। জাতীয় ঐক্য সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্ব-শৃংখলা-সম্প্রীতি-সহমর্মিতা, পারস্পরিক ভালোবাসা শ্রদ্ধাবোধ ও সামাজিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সোপানই হলো জাতীয়তাবাদ। এ ব্যতীত জাতীয় স্বাধীনতা স্বকীয়তা অহংবোধ ও সার্বিক স্বার্থ কল্যাণ সমৃদ্ধি সুসহংত সংরক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতীয়তাবাদ এমন একটা চেতনাদৃপ্ত শক্তি যা অন্য কোনো রাষ্ট্র বা জাতির প্রভুত্ব প্রভাব আধিপত্য ও ভীতিকে পরোয়া করে না।

জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক পটভূমিকা উদ্ভব এবং এর গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য না জানলে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ কি এবং কেনো তা অনুধাবন করা দুরূহ বিধায় এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিত আলোকপাত করা হলো।

জাতীয়তাবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা জানতে পেরেছি যে, আদিমকালে বিভিন্ন উপজাতির অগ্রসরমান ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পদভিত্তিক জনগোষ্ঠী জীবনযাপনের নিরাপত্তা ও তাদের অপহরণকৃত ব্যক্তিসম্পদকে ব্যক্তিমালিকানায় ভোগদখলে রাখার লক্ষ্যে আদিম সমষ্টিগত চিন্তা ও সাম্যবাদী সমাজের গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে অন্যত্র একটি নিরাপদ ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। আদিম সাম্যবাদী সমাজে বসবাসরত মানবগোষ্ঠির নির্দিষ্ট কোনো আবাসভূমি বা আবাসস্থল ছিলো না। এবং সে-সমাজে ব্যক্তিসত্ত্বা, ব্যক্তিচিন্তা, ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিসম্পদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনই অবকাশ ছিলো না। তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থের ধারক বিশেষ মানবগোষ্ঠী তথা উপজাতীয় প্রধান, সমরপ্রধান, উৎসবপ্রধান, বাণিজ্যপ্রধান, কৃষকপ্রধান, কুটিরশিল্পপ্রধান ও অন্যান্য প্রভাবশালীগোষ্ঠীর লোকদের অন্যত্র বসবাসের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ আদিসমাজে ফিরে গেলে তাদের অর্জিত ধনসম্পদ সমাজের সমষ্টিগত মানুষের মালিকানায় দিয়ে দিতে হতো। এভাবে বিভিন্ন উপজাতি থেকে আগত একই চিন্তাধারণার লোকদের আগমন ঘটতে থাকে নতুন ও নিরাপদ সামাজিক কাঠোমোর মধ্যে। এই সম্পদশালীগোষ্ঠী নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে নিজেদের মধ্যে থেকে এবং আদি সমাজের মধ্য থেকে শক্তিমান সাহসী লোকদের সম্পদের লোক দেখিয়ে বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লোকজন ক্রয় করে এ সমাজে একটি শক্তিশালী লাঠিয়াল বা সমরবাহিনী গড়ে তোলে।

কালক্রমে স্থানীয় উপজাতি ও ভিনউপজাতি থেকে আগত লোকজন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একই চিন্তাচেতনা ও আর্থবৈষয়িক ব্যবস্থা নিয়ে বহুকাল যাবত একত্রে বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, আচার-ব্যবহার, ভাষা-সংস্কৃতি বিশ্বাস আত্মীয়তা সখ্যতা সম্প্রীতি সহমর্মিতা প্রভৃতি একই

দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে ওঠে। একইভাবে মানস ও সামাজিক রীতিনীতি গতিপ্রকৃতি পরিবেশ গড়ে ওঠে। একইভাবে তাদের মধ্যে পরোক্ষ রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে— পেশাগত বা একই চিন্তাধারার ভিত্তিতে জাতিসত্ত্বার উদ্ভব ঘটে। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটতে থাকে। আর এ জাতিসত্ত্বার গর্ভ থেকেই কালক্রমে রাষ্ট্রসত্ত্বার আবির্ভাব ঘটে এক একটি অগ্রসরমান অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্র, রোমের ট্রামভাইরেক্ট পদ্ধতি ও অন্যান্য অগ্রসরমান মানবগোষ্ঠীর বসবাস অঞ্চলে রাষ্ট্রসত্ত্বা একই নিয়মে আবির্ভূত হয়েছিলো বলে আমরা জানতে পারি। সুতরাং জাতি ও জাতীয়তাবাদের কনসেপ্ট বা চিন্তাচেতনার ইতিহাস অতি প্রাচীন। তবে সত্যিকারার্থে জাতীয়তাবাদের সুষ্ঠু চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছে উনবিংশ শতাব্দির প্রথম ধাপ থেকে।

ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোকে একইভাবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকেও বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

তবে এ কথাটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রাচীনকালে জাতিসত্ত্বার উন্মেষ ঘটেছিলো ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিসম্পদের সীমাহীন লোভ-লালসা শোষণ ও প্রভাব প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে। আর বর্তমানে জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদেশী কোনো রাষ্ট্র বা অন্য কোনো জাতির শাসন শোষণ আধিপত্য সম্প্রসারণ থেকে জাতীয় স্বাধীনতা স্বকীয়তাকে মুক্তকরণ এবং নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠাকরণ। তবে বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি নির্ভর করে জাতির আশা-আকাংখা-রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাবধারা ও জাতীয় নেতৃত্বের কার্যকলাপের ওপর। সেই নেতৃত্বের কার্যক্রমের ফলে জাতি দেশী-বিদেশী শাসক শোষকদের কবলে পতিত হতে পারে অথবা শোষণহীন সমাজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আধুনিক জাতি বা জাতীয়তাবাদ মূলতঃ এ সব প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে বা উঠছে।

আমরা জানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বাংলাদেশের মাটি ও ধনসম্পদের টানে এদেশে আগমন করেছে। কালক্রমে স্থানীয় ও বহিরাগত জনগোষ্ঠী এখানে নানাভাবে মিলেমিশে গিয়েছে। তাদের পারস্পরিক বিশ্বাস আচার-ব্যবহার, আদান- প্রদান, চলাফেরা, উঠাবসা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ব্রত ধর্মবিশ্বাস ভাষা-সাহিত্য কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, সম্পর্ক-সম্বন্ধ-আত্মীয়তা প্রভৃতি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গড়ে উঠে কালক্রমে সর্বস্বীকৃতরূপ পরিগ্রহের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বার উদ্ভব ঘটেছে।

ঐতিহাসিক নানান বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়, যুগ যুগ ধরে অজস্র ঘটনাপ্রবাহের বাস্তব ফলশ্রুতিতে আবহমান বাংলার শাশ্বত চিরায়ত ঐতিহ্যের যে সুবিশাল ক্ষেত্র বা পটভূমি সৃষ্টি হয়েছে, তারই চেতনার বহিঃপ্রকাশ হলো বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বা বা

জাতীয়তাবাদ। আমাদের ঐতিহ্য ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সামাজিক মূল্যবোধ ও জাতীয় মানসের উত্থান এবং বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি সহমর্মিতা-সহনশীলতা ভ্রাতৃত্ববোধ তথা বাঙ্গালী মানসের গণতান্ত্রিকবোধ ও অহংবোধ আমাদের সাম্য মৈত্রী ঐক্যকে বলিয়ান ও সংহত করেছে। তবে এ সবই হলো হালামলের কথা। এর পূর্বে বাঙ্গালীর স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা থাকলেও স্বতন্ত্র জাতি বা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেনি বললেই চলে। তবে জাতির কোনো কোনো ব্যক্তিত্ব যে জাতীয় স্বাতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচেষ্টা চালাননি— তাও বলা যাবে না। ক্ষীণ কার্যক্রম বা প্রচেষ্টা যুগে যুগে চলেছে, বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বার চিন্তাচেতনার ক্ষীণপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু বিদেশী শক্তির দানবীয় থাবার ফলে তা বিকশিত হতে পারেনি। সুপ্তভাবেই বাঙ্গালীত্বের ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

বহু শতাব্দির পরাধীনতার গ্লানি, অপমান, বিদ্রোহ ও সংগ্রামের উত্তাপ এবং ১৯৪৭ সালে তথাকথিত ধর্মভিত্তিক জাতিতত্ত্বে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রহসন এবং পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের স্বৈরাতান্ত্রিক শাসন-শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন, অবিচার বৈষম্যমূলক আচরণ প্রভৃতি ধর্মের নামে চালিয়ে যেতে থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বা ও জাতিগত চেতনার জাগরণ ঘটতে থাকে। অবশ্য এর পূর্বে ভারত-পাকিস্তান প্রস্তাবের পাশাপাশি বাঙ্গালী জাতির স্বাতন্ত্রতার প্রশ্ন তুলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসু বৃহত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রস্তাব তুলে ধরেছিলেন। এর পূর্বে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলনের মধ্য দিয়েও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটেছিলো। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় নেতৃত্ব, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এবং শোষক ধর্মীয় নেতাদের কূটকৌশলে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ সুফল লাভ করতে পারেনি। পরবর্তীতে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ধূম্রজালে বা ধর্মীয় গোড়ামীর শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে এদেশেরই নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও ব্যক্তিস্বার্থের বলির পাঠায় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ম্লান হয়ে যায়।

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাঙ্গালীরা অতিসম্প্রতি প্রত্যক্ষ করতে লাগলো পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক-শোষকদের স্বৈরাচারী শাসন শোষণের কার্যক্রম ও চেহারা। আর ঐ স্বৈরাচারী শাসন শোষণ বঞ্চনার শিকারে নিপতিত হয়ে জাতি বুঝতে লাগলো তারা কি হারিয়েছে। এরপর তারা মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলো। আর তাদের মুক্তির পথ বাতলে দিতে এগিয়ে এলেন ছাত্র যুবনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই সর্বপ্রথম পাকিস্তানী শাসক শোষকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮ সালের ১ লা জানুয়ারী ঢাকার লালবাগে পাঞ্জাবী সৈন্যরা বাঙ্গালী পুলিশের ওপর নির্মম হত্যাকাণ্ড চালানোর প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার নেতৃত্ব প্রদান করেন শেখ মুজিব। ঐ প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্যে ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের এক জনসভায় ছাত্রনেতা

শেখ মুজিব তাঁর অগ্নিক্ষরা বক্তৃতায় দ্ব্যর্থহীনভাষায় ঘোষণা করেনঃ 'আপনাদের অত্যাচার নির্যাতন বন্ধ করুন। বাঙ্গালী হত্যার বিচার করুন, নইলে এই দেশে আপনাদের থাকতে দেয়া যাবে কিনা তা আমাদের ভাবতে হবে'। ঐ জনসভায় তিনি সর্বপ্রথম মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটান। অন্যান্য ছাত্র যুবনেতারা— সাধারণ ছাত্রজনতাও তাঁকে অনুসরণ করলো। এভাবেই বাঙ্গালীত্বের জাগরণ সূচিত হলো। ১৯৪৮ সালের ৪ ঠা জানুয়ারী মুজিবের নির্দেশে ও পৃষ্ঠপোষকতায় "ছাত্রলীগ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বার স্ফূরণ ঘটলো।

বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বার স্ফূরণ আরো চেতনাদৃপ্ত হলো বিশেষ করে ১৯৪৮ সালে যখন আমাদের মাতৃভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-কৃষ্টির ওপর পাকিস্তানী শাসক শোষকগোষ্ঠীর প্রভূপুরুষ গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্বয়ং আঘাত হানেন। সেই আঘাতের জবাব-প্রতিঘাত ও প্রতিশোধের জ্বালা এবং জাতীয়তাবোধের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ জাতীয় মান-মর্যাদা-সম্ভ্রমে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে বাঙ্গালী নতুন করে ভাবতে শুরু করে। বাঙ্গালীর জাতীয় অহংবোধ ক্রমান্বয়ে জাগ্রত হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয় যখন জাতিগত আশা-আকাংখা-স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিদেশী শাসন শোষণ পীড়ণ থেকে নিজেদের মুক্ত করার একটিই মাত্র পথ খোলা থাকে— তাহলো আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তথা জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন। জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে শত অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে, ত্রিশলক্ষ বাঙ্গালীর বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙ্গালী জাতি প্রাণপ্রিয় জাতীয় স্বাধীনতাকে অবর্ণনীয় বেদনা ও সীমাহীন জয়োল্লাসের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই যে জাতিগত সংগ্রামের বিজয়, এটাই হলো বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ফলশ্রুতি। এই যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক উজ্জীবন, এটা হঠাৎ করে একদিনে একটি ঘটনার কারণে উত্থিত হয়নি। এর পেছনে রয়েছে বহু যুগের সংগ্রামী পটভূমিকা ও ২৩ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। আর এই ২৩ বছরের সংগ্রামের উদ্‌গাতা-প্রাণপুরুষ হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঢাকার কার্জন হলে আয়োজিত সমাবর্তনানুষ্ঠানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, পাকিস্তানের জাতির জনক উর্দুভাষী (যে উর্দুভাষা পাকিস্তানের জনসংখ্যার মাত্র ৪% লোকের ভাষা) মোহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের ৫৬% ভাগ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে তাদের ওপর উর্দুভাষা চাপিয়ে দিয়ে এদেশের জনগণকে নতুন করে উপনিবেশিক শাসন-শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট করার হীনলক্ষ্য সদর্পে ঘোষণা করলেনঃ উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। আর সঙ্গে সঙ্গেই এদেশের ছাত্র-যুবক-জনতার কণ্ঠস্বর সংগ্রামী শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে উঠলেনঃ 'না, না!

বাংলাই হবে রাষ্ট্রভাষা।' সেই সাথে তাঁর অনুসারী ছাত্র যুবক-জনতাও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলো। এভাবেই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদের প্রথম সাংগঠনিক বিস্ফোরণ ঘটলো, বাঙ্গালীর স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটলো। আর এর পূর্ণাঙ্গতার রূপ পরিগ্রহ করলো ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান সরকারের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গন—বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনে রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম, শফিকসহ নাম-না-জানা শহীদদের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতাও ছিলেন শেখ মুজিব। তিনি তখন এ আন্দোলনের কারণে কারাগারে বন্দী। সহকর্মীদের আইনভঙ্গ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি কারাগারে আমরণ অনশন ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। এ আন্দোলনের চাপে নত হয়ে শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এভাবেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বিজয় সূচিত হলো।

তাই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ হলো ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। আর এর সাথে যুক্ত বাংলার শাশ্বত চিরায়ত আচার-ব্রত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-আত্মিক পেক্ষাপট তথা জাতীয় স্বকীয়তা ও আত্মশাসনের দুর্দমনীয় স্পৃহা বা বিদেশী শাসন-শোষণ ও মোড়লিপনা থেকে সার্বিক মুক্তির আকাংখা। অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা-কৃষ্টির সার্বিক স্বাধীন সমন্বিত প্রেক্ষাপটে প্রোথিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত হয়ে ষাটের দশকে বাঙ্গালী হৃদয়ের পরম পূজ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে হঁটিয়ে উর্দু-ফার্সী কবি ইকবালকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করার শাসক-শোষক ও তাদের তাবেদার গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী ছাত্র-যুবক-বুদ্ধিজীবী-জনতা সংগ্রাম করেছে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে তথাকথিত 'ইসলামী কবি' বানানোর হীনপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাঙ্গালী প্রতিবাদ করেছে। এই দুই মহান মানবতাবাদী কবি, সাম্যের কবি তাঁদের কবিতা-সংগীত-লেখনীতে বাঙ্গালী জাতিকে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিশেবে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাই শাসকগোষ্ঠী এই দুই মহান কবিকে বাঙ্গালীমানস থেকে মুছে ফেলার জন্যে প্রকারান্তরে তাদেরকে অপদস্ত ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে নানান অপপ্রয়াস চালিয়ে ছিলো। এ ব্যতীত বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, কবি সুকান্ত, শরৎবসু, সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক, নেতাজী সুভাষ বসু—ইতিহাসের নবাব সিরাজদৌল্লা, মোহন লাল, মীরমদন, মীরকাশিম প্রমুখ বিপ্লবী বাঙ্গালী চেতনার পুরুষদের প্রতি শাসক-শোষকগোষ্ঠীর সীমাহীন অবজ্ঞা ও ঘৃণার দৃষ্টি কাজ করেছিলো। কারণ তাঁদের জীবন দর্শন ও কার্যক্রমের মধ্যে বাঙ্গালীত্বের বহি:প্রকাশ

তথা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটেছিলো। বাঙ্গালী জাতি জাতীয় দুর্যোগে তাঁদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকে।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পূর্ণপ্রকাশ ঘটে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। তিনিই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উদ্‌গাতা। তাঁকে কেন্দ্র করেই বাঙ্গালী জাতি নতুন উদ্যমে, নতুন চেতনায় নিজেদের ঠিকানার সন্ধান লাভ করে।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী জাতির স্বাধিকার বা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবীর আন্দোলন শুরু করেন তার মধ্যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রসন্ন প্রকাশ ঘটে। শাসক-শোষকগোষ্ঠী ৬ দফার বিরুদ্ধে অস্ত্রের হুমকী প্রদান করে। ৬ দফার দাবী প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাঙ্গালীজাতির মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও বৈপ্লবিক মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকলে শাসক-শোষকগোষ্ঠী বাঙ্গালীর দাবীকে, আন্দোলনকে বানচাল করে দেশবাসীর দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে তারা ১৯৬৬ সালের ৮ই মে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ক্ষমতাবলে গ্রেফতার করে কারান্তরালে নিক্ষেপ করে। অবশেষে তাঁর বিরুদ্ধে কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ফেঁদে বাঙ্গালীর স্বাধিকার এবং জাতীয়তাবাদী জাগরণকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিতে অপচেষ্টায় মেতে উঠলে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে প্রবল বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে এবং তা অবশেষে প্রবল গণ-অভ্যূত্থানের রূপ নেয় এবং এভাবেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মহাজাগরণ সূচিত হলো। বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ৬৮ হাজার গ্রাম থেকে শ্লোগান উঠলোঃ জেগেছে জেগেছে বাঙ্গালী জেগেছে, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ, জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনবো, আগরতলা মামলা তুলে নাও, 'জয়বাংলা' ইত্যাদি। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়ের মধ্য দিয়ে 'জয়বাংলা' শ্লোগান আমাদের জাতীয় শ্লোগানে পর্যবশিত হলো। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বিজয় মানে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বিজয়। কিন্তু নির্বাচনের রায় বানচাল করে দিতে শাসকগোষ্ঠী নানান তালবাহানার আশ্রয় নিলে বাঙ্গালী জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। চারদিক থেকে শ্লোগান উঠলোঃ পাকিস্তানকে লাথি মারো বাংলাদেশ স্বাধীন করো, মুজিব তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে, বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো। ২৫ শে মার্চ পাকবাহিনী বাঙ্গালী জাতিকে চিরতরে খতম করার লক্ষ্যে বাঙ্গালী জাতির ওপর অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাঙ্গালী জাতি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নির্দেশে ও নামে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়। এভাবে জাতীয়তবাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে রক্তাক্ত বিপ্লবের

পথ বেয়ে বাঙ্গালী জাতি মাত্র ৯ মাসের মধ্যে পাকবাহিনীকে পরাজিত করে জাতীয় স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে আনে।

এভাবেই ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ সমৃদ্ধশালী ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর 'জয়বাংলা' শ্লোগান ও 'বঙ্গবন্ধু'ই হলো বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্বারক-প্রতীকসত্ত্বা।

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতীয়তাবাদী চেতনার সম্প্রসারণ ঘটলো সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে জাতীয় সংবিধানের মধ্যে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ বলা যায় জাতীয়তাবাদের সার্বিক চেতনাকে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রবাহিত করে দেশ গঠনের বা স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী হাতিয়ার হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করে অর্থনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের সোপান সৃষ্টি করেছিলেন। এ কারণেই গণতন্ত্র তো বটেই, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে আরো শক্তিশালী, সমৃদ্ধশালী পরিবর্ধন ও শ্রীবৃদ্ধি করা হয়েছে। এই জাতীয়তাবাদের চেতনাদৃপ্ত শক্তিকে জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তির বিপ্লবের প্লাটফরম 'বাকশাল' এর অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিশেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে চির প্রবহমান করার লক্ষ্যে শোষিত বঞ্চিত দীন-দুঃখী মেহনতী বাঙ্গালীকে একটি একক তথা সর্বশ্রেণী বা সর্বপেশাভিত্তিক জাতীয় রাজনৈতিক দলে একীভূত করে তাদের জন্যে, তাদের দ্বারা এবং তাদের দিয়ে গঠিত সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরই 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' শাসন প্রতিষ্ঠা তথা একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক , প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় বৈপ্লবিক কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত পথেই কেবল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত, সংরক্ষিত ও সুসংহত করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

ঘ. ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা হলো পবিত্র কোরান, ইসলাম, গণতন্ত্র ও আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সাম্যবাদের অন্যতম প্রধান শিক্ষা। অতএব ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় বা নাস্তিকতাবাদ নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থঃ প্রচলিত সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা, সকল ধর্মের পবিত্রতা সংরক্ষণ এবং কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাত, কারো ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ বা ধর্ম নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসা—ছলচাতুরী, জুয়াখেলা, প্রতারণা, শঠতা, বাড়াবাড়ি, হানাহানি, অন্যায়, জুলুম, শোষণ ইত্যাদি নয়। সামাজিক সাম্য মৈত্রী ঐক্য ভ্রাতৃত্ব সম্প্রীতি সহমর্মিতাবোধ, শৃংখলা প্রতিষ্ঠা-সংরক্ষণ ও সংহত

করাই হলো ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য। প্রতিটি ধর্ম তার অনুসারীদের অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংস ও চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতার সাথে এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে, মানুষ তার সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট-অভাব-দারিদ্র্যতা, অসংগতি-হতাশা ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে ধর্মকেই আশ্রয়স্থল মনে করে। ধর্মের মধ্যেই মানুষ ইহজাগতিক ও পারলৌকিক যাবতীয় শান্তির লক্ষ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে নিতে চায়। প্রত্যেক মানুষ যাতে তার শান্তির লক্ষ্যে সান্ত্বনা পাওয়ার জন্যে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস-আচার-অনুষ্ঠান-ব্রত স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে সেটাই হলো ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম মূল লক্ষ্য।

তবে ধর্মকে কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র ও জাতীয় রাজনীতিতে টেনে আনা যাবে না। মনে রাখতে হবে, এই বাংলাদেশ কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় তথা এককভাবে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানের নয়। সকল ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়ের লোকদের সম্মিলিত একক মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ। সম্মিলিতভাবে আমরা এদেশকে পাকিস্তানের শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত করেছি। আর এর মূলেই—এ সম্মিলিত সংগ্রামের মূলেই ছিলো ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ।

ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তাচেতনা ধ্যান-ধারণা ও আদর্শই কেবলমাত্র বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য-সাম্য-মৈত্রী-সহযোগিতা-সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করতে পারে, যেমন করেছিলো ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধকালে। জাতীয় ঐক্যই হলো জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে একতাবদ্ধ জাতিকে কোনো শক্তিই পরাজিত করতে পারে না। জাতির সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতেই কেবলমাত্র একটি সমৃদ্ধশীল জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই পেক্ষাপটে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। তবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শই একটি শ্রেণীহীন, স্তরহীন, শোষণহীন, বিবাদহীন গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রদান ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

ধর্ম যেহেতু মানবসমাজে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক জাতিসত্ত্বার ধ্যান-ধারণার উন্মেষ ঘটিয়ে জাতীয় সার্বিক ঐক্য ও জাতীয়তাবাদকে ক্ষুন্ন করে, যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সৃষ্ট পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে। পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে ধর্মের নামে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-শোষণ-বৈষম্য-অত্যাচার-নির্যাতন নিপীড়ন-ব্যভিচার-বর্বরতা-পৈশাচিকতা-প্রতারণা-শঠতা, ইত্যাদি জঘন্য কার্যকলাপ বাঙ্গালী জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে—যার প্রতিবাদে বিক্ষোভে প্রতিরোধে অপমানের প্রতিকারে আমরা ভাষাভিত্তিক একই ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত হয়ে, শত অত্যাচার-নির্যাতন-রক্তপাত-জীবনপাত ও

ত্যাগতিতিক্ষার মধ্য দিয়ে; চাপিয়ে দেয়া এক সর্বাত্মক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে পদদলিত করে বাংলাদেশকে মুক্ত করেছি। এই বিদেশী শাসন শোষণ থেকে মুক্ত বাংলাদেশে যেহেতু বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় একসাথে বসবাস করছে সেহেতু রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক নীতিমালায় একটি বিশেষ ধর্মকে বা ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিদারুণভাবে ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। এতে করে জাতীয় ঐক্য, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হয়ে পড়বে বিপন্ন। পরিণামে ধর্মকে কেন্দ্র করে দেশ একটি গৃহযুদ্ধ হানাহানি মারামারি ও হিংসা-বিদ্বেষের তিমিরে হাবুডুবু খাবে, বিদেশী কোনো শক্তি এর সুযোগে দেশকে গ্রাস করে ফেলবে। সুতরাং দেশ-জাতি ও স্বাধীনতার সার্বিক সংরক্ষণ সংহতি সমৃদ্ধি ও কল্যাণের লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠিত করা ব্যতীত অন্য কোন গত্যন্তর নেই।

তাছাড়া ধর্মভিত্তিক জাতি বা রাষ্ট্র কস্মিনকালে কোথাও হয়নি বা হলেও স্থায়ী হয়নি। এমন কি খোদ আরববিশ্বে একই ভাষা, একই সংস্কৃতি, সাহিত্য, কৃষ্টি, শিল্পকলা আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদ-সর্বোপরি একই ধর্ম, একই সামাজিক অর্থনৈতিক, একই ভৌগোলিক জলবায়ু প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লালিত-পালিত ও একই মন-মানসিকতার ঐতিহ্যে বন্ধনে আবদ্ধ থাকার পরও আরব বিশ্বের জনগণ একটি অভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। কোনোকালে পারবে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। আরব তথা মুসলিম বিশ্বের বকধার্মিক গোঁড়া শাসক-শোষকদের শাসিত তথাকথিত ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনাধ্যুষিত রাষ্ট্র যেমন—ইরাক, সিরিয়া, মিশর, তুরস্কো, লেবানন, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, আফগানিস্তান, ইয়েমেন (উত্তর), ইন্দোনেশিয়া, ফিলিস্তিন, বাংলাদেশ (বঙ্গবন্ধুর আমলে) প্রভৃতি রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেছে। সুতরাং ধর্মভিত্তিক জাতি বা রাষ্ট্র প্রগতিশীল মানবসমাজে পুরোপুরি অচল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানের কতিপয় বাণী উল্লেখ করতে হয়। যেমন ঃ যার ধর্ম তার তার কাছে; ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই; কোন ধর্ম সঠিক, কোন ধর্ম বেঠিক তা নির্ণয়ের ভার একমাত্র আল্লাহর ওপর এবং 'মুসলমান, খৃস্টান, ইহুদী, পলিথিয়েস্ট, সেবিয়ান, মেজিয়ানস, স্ক্রিপচার্স এবং অন্যান্য এবং যিনি এক আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করেন তাদের কোনো ভয় নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।' এভাবে পবিত্র কোরান ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। মহানবীর শাসনের ১০ বছর এবং খেলাফতে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পুরোপুরি মেনে চলা হয়েছিলো। তাই সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মকে টেনে

আনা কোনো প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নয়। শোষণহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধরে রাখতে হবে।

সুতরাং উপরোক্ত কারণেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক মৌলনীতিমালার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সযত্নে স্থান দিয়েছেন। তবে ব্যক্তিজীবনে যে কেউ যে কোনো ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে, কেউ কারো ধর্মের প্রতি আঘাত বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারবে না, বা কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য কোনো সম্প্রদায় আক্রান্ত না হয় তার জন্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের বীজ।

উপরোক্ত রাষ্ট্রীয় চার মৌলনীতিমালা পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এই চারটি মৌলনীতি—প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সাথে সুসম্বন্ধ ও সুসংঘবদ্ধ। একটাকে বাদ দিয়ে অপর ক'টি মূল্যহীন। এই চার মৌলনীতির সুসম্বন্ধ ও সুমন্বয়ের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, প্রশাসনিক দর্শন ও কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। আর এই দর্শন কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার জাতীয় প্লাটফরম হিশেবে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল সংগঠনের উদ্ভব হয়েছে।

বাকশাল গঠনোপলক্ষে জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ

"একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমরা স্বাধীনতা পেলাম এবং রক্তের বিনিময়ে পেলাম সাড়ে সাতকোটি লোক, ৫৪ হাজার স্কোয়ার মাইল। সম্পদ বলতে কোনো পদার্থ আমাদের ছিলো না। সমস্ত কিছু ধ্বংস।   কিন্তু পাকিস্তান, দুঃখের বিষয়, একটা পয়সা পর্যন্ত দিলো না। আমরা ছিলাম ৫৬ পার্সেন্ট পপুলেশন, কেন্দ্রীয় সরকার কোনো সম্পদ আমাদের দিলো না। ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ আমাদের ছিলো না। গোল্ড রিজার্ভ আমাদের ছিলো না। ..... এক কোটি লোক চলে গিয়েছিলো, তারা ফিরে এসেছে। তাদের রিহ্যাবিলিটেশন দরকার। ওয়ার্লড ইনফ্লেশন যা আমার হাতে, আপনার হাতে নয়। জিনিসের দাম বেড়ে গেলো। ড্রাউট হলো বাংলাদেশে, এই সাউথ-ইষ্ট এশিয়াতে ফ্লাড্ হলো। সাড়ে সাতকোটি লোক। দুশো বছরের গোলামী। অর্থনৈতিক কাঠামো নেই। একটা ফরেন অফিস নেই, একটা প্লানিং অফিস নেই। নেই একটা কোনো কিছু।

এই সুযোগে, যারা আমাদের স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিলো, নিজেদের একটা বেস্ করা যায় কিনা, ভবিষ্যতে তাদের স্ট্রুজরা এদেশে সরকার চালাতে পারে কিনা, তার ফিকির খুঁজতে লাগলো। কাজ করবো না ফাঁকি দেবো। অফিসে যাবো না ফাঁকি দেবো, ফ্রিষ্টাইল। দেশের শত্রুরা এন্‌জয়েইং ফুল লিবার্টি। বিদেশীরা আসেন এখানে, তাদের গোপনে দু'বোতল মদ খাইয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্রিফ করে দেয়া হয়। আমরা কিন্তু চেষ্টা করলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা বলো, আচ্ছা করো। আচ্ছা দল গড়ো, আচ্ছা লেখো, আচ্ছা বক্তৃতা করো, বাধা নেই। ফ্রি-হ্যান্ড। কিন্তু দেখতে পেলাম কি?

আমরা যখন এই পন্থায় (প্রচলিত গণতান্ত্রিক পন্থায়) এগুতে শুরু করলাম, বিদেশীচক্র এদেশে মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠলো। তারা এদেশের স্বাধীনতা বানচাল করার জন্যে ষড়যন্ত্র শুরু করলো এবং ফ্রিস্টাইল শুরু হয়ে গেলো। হুড় হুড় করে বাংলাদেশে অর্থ আসতে আরম্ভ করলো। দেশের মধ্যে শুরু হলো ধ্বংস, একটা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ।

মোট কয়েক হাজার কর্মীকে হত্যা করা হলো। যারা নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেছে, মুক্তিবাহিনীর ছেলে, তাদেরকে হত্যা করা হলো। এতো অস্ত্র উদ্ধার করি তবুও অস্ত্র শেষ হয় না। (গণতন্ত্রের সুযোগে) এই রাজনীতির নামে হাউজ্যাক, এই রাজনীতির নামে ডাকাতি, টেলিফোন করে মানুষের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে

বা মানুষের বাড়িতে গিয়ে গহনা কেড়ে নেয়। এ রাজনীতির নামে একটা ফ্রিস্টাইল শুরু হয়ে গেলো। তাই এ রাজনীতি আমি চাই না, এ গণতন্ত্র আমার মানুষ চায় না।

আমি চাই শোষিতের গণতন্ত্র, শোষকের নয়। এখনো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। যে মানুষের কাপড় নাই, যে মানুষ বন্ধু খুঁজে পায় না, যার বুকের হাড্ডি পর্যন্ত দেখা যায়, আমি জীবনভর এদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছি। এদের পাশাপাশি রয়েছি। কারা নির্যাতন ভোগ করেছি। আমার সহকর্মীরা জীবন দিয়েছে। তাদের দুঃখ দূর করার জন্যে আমি একদিন এই হাউজে বলেছি, আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই। যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে, যারা বড়ো বড়ো অর্থশালী লোক, যারা ভোট কেনার জন্যে পয়সা পায় তাদের গণতন্ত্র নয়, শোষিতের গণতন্ত্র। এটা আজকের কথা নয়, বহু দিনের কথা আমাদের।

কিন্তু ফ্রিস্টাইল মানে গণতন্ত্র নয়। এমেন্ডমেন্ড কনেষ্টিটিউশনে যে নতুন সিস্‌টেমে আমরা যাচ্ছি তাও গণতন্ত্র, শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। কেউ যদি মনে করেন যে, জনগণের ভোটের অধিকার আমরা কেড়ে নিয়েছি তাহলে আমি বলবো, না, এতে পার্লামেন্টের মেম্বাররাও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তাঁকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। সর্বক্ষেত্রে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে।

বহুদিন কারাগারে একলা একলা চিন্তা করেছি, আমার দেশের শতকরা ২০ জন লোক শিক্ষিত, তার মধ্যে এক গ্রুপ পলিটিশিয়ান হয়ে গেলাম। এক গ্রুপ আমরা বুদ্ধিজীবি। এক গ্রুপ টিচার। এক গ্রুপ সরকারী কর্মচারি ও ব্যবসায়ী হয়ে গেলাম। কেউ ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেলাম। কেউ অমুক হয়ে গেলাম। আমার সমাজে যতো জ্ঞাণী-গুনী লোক আছে এবং অন্য ধরনের, তাদের নিয়ে জাতীয় পুল করা দরকার। এই পুল আমি করতে পারি যদি আমি একটা নতুন সিস্‌টেম চালু করতে পারি এবং নতুন দল, সৃষ্টি করি জাতীয় দল, যার মধ্যে একমাত্র একপথ একভাবে এক হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায়। যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে তারা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্যে কাজ করে যেতে পারে, এ জন্যেই বাকশাল করা হয়েছে।

আজকে আপনারা মনে রাখবেন যে নতুন জাতীয় দল (বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ) বাকশালে আর্মী, নেভী, এয়ারফোর্স, সরকারি কর্মচারি, বেসরকারী কর্মচারি, পলিটিশিয়ান, শিক্ষাবিদ, ডক্টরস, বুদ্ধিজীবি, ইঞ্জিনিয়ার্স, যদ্দুর সম্ভব তাদেরও রাখার চেষ্টা করেছি। লেট আস্‌ ওয়ার্ক টুগেদার। পার্টি মানে কি জানেন ? পলিটিক্যাল পার্টি মিন্‌স এ ফ্যামিলি যার মধ্যে আছে আইডিওলজিক্যাল এফিনিটি। সেই জন্যে এই পার্টিতে উই আর ওয়ান ফর সাম পার্টিকুলার

পারপাসেস হোয়্যারেভার উই আর। আমাদের আদর্শ হলো, "বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিশেবে ইজ্জত সহকারে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখা। বাংলার দুখী মানুষকে পেট ভরে খাবার দেওয়া। শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা, যেখানে অত্যাচার অবিচার জুলুম থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না। লেট আস অল ট্রাই ফর দ্যাট। আসুন আমরা চেষ্টা করি সকলে মিলে ।"

বাকশাল প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গঠিত জাতীয় দল 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' বা বাকশালের পরিপ্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের মধ্যে বলা হলোঃ "রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোনো একটা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে" জাতীয় দল (বাকশাল) গঠন করতে পারবেন। তাই বাকশাল গঠন করে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ব্যবস্থা নিলেন, যে মূলনীতিতে বলা হয়েছেঃ "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন যাহাতে নাগরিকদের জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়ঃ

ক. অন্ন বস্ত্র আশ্রয় শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

খ. কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

গ. যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের এবং

ঘ. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার ....।"

"নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্যে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

"কর্ম হইতেছে প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী'—এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্যে পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।"

"রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিশাবে কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে পারিবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রসারের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণত্ব অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।"

জাতীয় দল বাকশাল গঠন করে বঙ্গবন্ধু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদার এই প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়াসী হলেন। তিনি মৌলিক মানবাধিকারের নেপথ্য নিয়ন্ত্রণকারী মুষ্টিমেয় টাউট রাজনীতিক, মতলববাজ আমলা, দুর্নীতিবাজ, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, চোরাকারবারী, চোরাচালানী, কালোবাজারী, মজুতদারী, সম্পদের মধ্যস্বত্বভোগী ও শোষক প্রতারকগোষ্ঠীর সীমাহীন ও ফ্রিস্টাইল অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষুধা দারিদ্র্য অশিক্ষায় অজ্ঞতায় অবহেলায় নিপীড়নে নির্যাতনে অত্যাচারে শোষণে ও নিষ্পেষণে জর্জরিত সমাজের বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবি মেহনতী জনগণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বাকশাল কর্মসূচী বা দ্বিতীয় বিপ্লবের বা সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি প্রদান করে প্রকৃত গণতন্ত্রকে নিশ্চিত ও সুসংহত করেছেন।

বাকশাল গঠনতন্ত্রের কতিপয় ধারা

প্রথম ধারা ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—

১। 'রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত একক জাতীয় দল 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে বর্ণিত 'জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র' বাঙ্গালী জাতির ঐক্য ও সংহতি বিধান, নরনারী ও ধর্মবর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান এবং মানবসত্ত্বার মর্যাদা ও মূল্যের স্বীকৃতি, মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি, ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন, কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতী ও অনগ্রসর জনগণের ওপর শোষণ অবসানের জন্যে পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণমুক্ত ও সুষম সাম্যভিত্তিক এক সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণ, সর্বাঙ্গীন গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও ক্রমিক যান্ত্রিকীকরণ ও সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলন, কৃষি ও শিল্পের প্রসার এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ও বন্টন নিয়ন্ত্রণে কৃষক-শ্রমিকের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান, মানুষের সাধারণ জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও অধিকতর কর্মসংস্থান, বিপ্লবোত্তর সমাজের প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ গণমুখি সার্বজনীন সুলভ গঠনাত্মক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন, অন্ন বস্ত্র আশ্রয় স্বাস্থ্যরক্ষাসহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণের মৌলিক সমস্যাবলীর সুষ্ঠ সমাধান, স্বয়ংসম্পূর্ন ও সয়ম্ভর অর্থনীতির সূদৃড়ভিত্তি রচনা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, বিচার বিভাগের কালোপযোগী জনকল্যাণকর পরিবর্তন সাধন ও জনজীবনের সর্বস্তর হতে দুর্নীতির মুলোচ্ছেদ করা, প্রশাসনকে গণমুখি গণতান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রিকরণ করা—এই সকল নীতিসমূহ ও উদ্দেশ্যাবলী সমগ্র জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত উদ্যম সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় বাস্তবে রূপায়িত করিতে অবিচল নিষ্টা, সততা, শৃংখলা ও দৃঢ়তার সহিত সর্বোতভাবে আত্মনিয়োগ করিবে।

২। বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে এবং সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করিবে।"

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশালের কাঠামো প্রকৃতি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ও লক্ষ্যকে একটি জাতীয়ভিত্তিক সম্মিলিত সর্বদলীয় সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরের তথা বিভিন্ন পেশাভিত্তিক জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও একক রাজনৈতিক প্লাটফরমের নীতিমালায় একত্রিত ও সুসমন্বিত করে প্রকৃত জনগণতান্ত্রিক শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতাকে সুসংহত ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল সুখীসমৃদ্ধ জাতিরাষ্ট্রে বিশ্বমানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করার মহান উদ্দেশ্যে একটি বৈপ্লবিক রাজনৈতিক আর্থসামাজিক প্রশাসনিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচী ও দিকদর্শন বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত ও উদ্ভাবিত হয় ১৯৭৫ সালের প্রথমার্ধে। অর্থাৎ বিশেষ করে চিরশোষিত চিরলাঞ্ছিত চিরবঞ্চিত চিরভাগ্যাহত চিরদরিদ্র চিরদুখী অধিকারহারা মেহনতী শ্রমজীবি বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীর 'গণতান্ত্রিক একনায়কতান্ত্রিক' শাসন ও তাদের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা তথা রাজনৈতিক আর্থসামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে যে রাজনৈতিক প্লাটফরম—সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছিলো বঙ্গবন্ধুর সার্বিক আদর্শের ভিত্তিতে সেটাই হলো 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল। এই বাকশালের কর্মসূচীকেই বঙ্গবন্ধুর 'দ্বিতীয় বিপ্লব'— অর্থনৈতিক মুক্তির বিপ্লব হিশেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাকশালের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে 'প্রকৃত গণতন্ত্র' তথা 'শোষিতের গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠাকরণ এবং শোষণের কালোহাতকে চিরদিনের মতো উৎখাত করার কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো।

বাকশাল—'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ'-এর শব্দগুলোর বাংলা এবং ইংরেজী লিখনের (Bangladesh Krishak-Shramik-Awami League) যোগফলের সমষ্টিভিত্তিক শিরোনাম হলোঃ বাকশাল (BKSAL)।

বাকশালের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক দর্শন ও কর্মসূচী বঙ্গবন্ধু কোনো বিদেশী রাষ্ট্র বা বিশেষ কোনো 'ইজম' থেকে আমদানী করেননি। তবে যে যে প্রক্রিয়া একটি জনগণতান্ত্রিক সাম্যবাদী শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা বিশ্বের ঐতিহাসিক বিশেষ প্রেক্ষাপট থেকে শিক্ষা গ্রহণ বা তা থেকে অনুপ্রাণিত হতে বাধা নেই। যেমন ইসলামের মহানবী আদিম সাম্যবাদী সমাজের ইতিহাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামন্তবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন শোষণ অত্যাচার

লাঞ্ছনার লেলিহান শিখায় পোড়-খাওয়া আরবীয় সমাজের বুকে ইসলামী সাম্যবাদী বিপ্লবের উত্তরণ ঘটিয়ে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চিন্তাধারা আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে 'খেলাফতে রাশেদীন' নামক একক দলীয় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তেমনি আধুনিক মার্কসীয় সাম্যবাদ আদিম সাম্যবাদ ও খেলাফতের ইসলামী সাম্যবাদ ব্যবস্থার অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছে। এখানেও ইসলামের মতো গণতান্ত্রিক একদলীয় শাসন ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

সাম্যবাদী চিন্তাধারার নিদর্শন আমাদের বাঙ্গালী আদিম সমাজ, উপজাতীয় বা কৌম সমাজ, ঐতিহ্যবাহী একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবারভিত্তিক সমাজ; ইংরেজ আমলে বিপ্লবী তীতুমীর, হাজী শরিয়তউল্লাহ, দুদুমিয়া, ফকির মজনুশাহ প্রমুখ বিপ্লবীদের নেতৃত্বে সমবেত হাজার হাজার বাঙ্গালী কৃষক মেহনতী জনতার সমাজ ও তাদের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক চিন্তাধারার মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

আমাদের মহান শিক্ষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী সাম্যবাদী সমাজ, বাংলার সাম্যবাদী বিপ্লবীদের আদর্শ, মহানবী ও ইসলামের খেলাফতে রাশেদীন ও মার্কসীয় সাম্যবাদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও অনুপ্রাণিত হয়ে এবং নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা, বাঙ্গালী জাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার আলোকে বাঙ্গালী জাতির আশা আকাংখা, মন-মানসিকতা, সামাজিক ভৌগোলিক পরিবেশ ইত্যাদির আলোকে এবং জাতির বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ও তাদের মৌলিক মানবাধিকার তথা জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা, সমাজদেহ থেকে শোষণ-বঞ্চনা-অবিচার- হিংসা- অত্যাচার-প্রতারণা চিরতরে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে বাকশালের রাজনৈতিক আর্থসামাজিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছেন। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

এ প্রসঙ্গে আমার এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেনঃ 'কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে বসে বসে আমি মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, বিশেষ করে আমার বাঙ্গালী সমাজের আদি ইতিহাস, কৌম ও জয়েন্ট ফ্যামিলি ব্যবস্থা, বিপ্লবী মহাপুরুষদের কার্যক্রম, ইসলাম ও মার্কসবাদ পর্যালোচানা করেছি। .....আমি নিজে একটি মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবার থেকে এসেছি, দেখেছি কৃষক জনতা কিভাবে শোষিত বঞ্চিত হয়। শ্রমিক মেহনতী মানুষের সাথে মিশেছি; অন্যান্য পেশার মানুষদেরও দেখেছি, কিভাবে তাদের শ্রম শোষিত হয়, কিভাবে আমার সাধারণ মেহনতী শ্রমজীবি মানুষ অধিকারহারা হচ্ছে, কে বা কারা কিভাবে তাদের শাসন শোষণ করছে; দাবিয়ে রাখছে। ....এ জন্যে আমি জীবনভর শোষিত বঞ্চিত অত্যাচারিত দুখী মেহনতী মানুষের রাজনৈতিক তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও তাদের

আর্থসামাজিক বা মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করেছি, জেল খেটেছি। অমানুষিক জুলম-নির্যাতন ভোগ করেছি। বুঝেছি, প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাবাধীন শোষণভিত্তিক সমাজকাঠামোই তাদের সকল দুর্দশা ও দুর্গতির মূল কারণ। এ কারণেই আমি জনগণের প্রকৃত গণতন্ত্র এবং একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে বাকশাল বা দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি দিয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা চিন্তাশক্তি ও শিক্ষা আমাকে শিখিয়েছে যে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েই আমার সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে। আমি তাই আমার কৃষক-শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবি মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে বাকশাল করেছি। এদেশের মানুষ রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে, ত্যাগ তিতিক্ষা দিয়ে, সীমাহীম দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করে আমার নির্দেশিত পথে সংগ্রাম করেছে, আমার চাওয়া-পাওয়ার অনেক বেশিই আমাকে দিয়েছে। আমিও তাই আমার জীবনের সবকিছু, এমন কি আমার জীবনটাকে তাদের কল্যাণে উৎসর্গ করার সংকল্প নিয়ে বাকশাল বা দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী দিয়েছি। এ পথ ব্যতীত বাংলার সাধারণ দীনদুখী মানুষের সার্বিক মুক্তি আসতে পারে না।'

'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' বলতে আমরা কি বুঝি ?

'বাংলাদেশ' বলতে আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে বুঝি।

'কৃষক' বলতে গ্রামবাংলায় বসবাসরত কৃষিপেশার সাথে সম্পৃক্ত বৃহৎ ভূঃস্বামী-কৃষক, মাঝারি কৃষিজমির মালিক-কৃষক, ক্ষুদে কৃষক, বর্গাদার বা ভাগচাষী ও ভূমিহীন কৃষক-মজদুরদের বুঝায়। এ ব্যতীত কৃষিকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশার লোকজনকেও বুঝায়।

'শ্রমিক' বলতে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন কুটির শিল্প, গঞ্জ-নগর-বন্দর ও শহরাঞ্চলের ছোটো-মাঝারি-বৃহৎ শিল্পকলকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তথা সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও বেসরকারী বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক কর্মচারীদের বুঝায়।

'আওয়ামী' বলতে কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারি-মজদুর ব্যতীত অন্যান্য নাগরিক যারা সরকারি বেসরকারি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার বিভিন্ন কলকারখানা শিল্প-বাণিজ্যিক ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত আছেন, যেমন গ্রাম-শহরাঞ্চলের উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী যথা, ভূঃস্বামী, জোতদার, মহাজন, ফড়িয়া, দালাল, ঠিকাদার, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পকলকারখানা—বাণিজ্যিক সংস্থার মালিক কর্মকর্তা, সরকারি, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সামরিক আধাসামরিক ও অন্যান্য আইন-শাসন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আদালতসমূহের উচ্চপদস্থ আমলা কর্মকর্তা

বিচারকদের বুঝায়। এ ব্যতীত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাহিত্যিক-সাংবাদিক-শিল্পী, আইনজীবি, রাজনীতিক প্রভৃতি তথাকথিত বিশিষ্ট ও সৌখিন পেশার লোকজনকে, এক কথায় গোটা জনগণকেই বুঝায়।

'লীগ' বলতে উপরোক্ত শ্রেণীসমূহের সমন্বিত প্লাটফরম—প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক সংগঠন বা রাজনৈতিক সংঘকে বুঝায়।

বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী জাতিকে উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীতে চিহ্নিত ও বিবেচিত করে সবাইকে অর্থাৎ ১০০% ভাগ জনগোষ্ঠীকে বাকশালের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সর্বশ্রেণী সম্মিলিত জাতীয় রাজনৈতিক দল বাকশালের মধ্যে শোষক-শোষিতকে পৃথক পৃথকভাবে বিভক্ত ও চিহ্নিত করা হয়নি। বৃহৎ ধনিক থেকে সর্বহারা ভিক্ষুককে রাজনৈতিকভাবে সমাধিকারের ভিত্তিতে বাকশালের পতাকাতলে টেনে নেয়া হয়েছে। আমরা জানি, শতকরা ৯৫ ভাগ দীনদুখী সর্বহারা শোষিত মেহনতী মানুষ আর বাকি শতকরা ৫ ভাগ শোষক ধনিক মানুষের মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা এক হ'তে পারে না। এদের প্রাত্যহিক কার্যক্রমও এক নয়। মূল কথা হলো, শোষক-শোষিতের দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা সবকিছুই হয় পরস্পরবিরোধী। শোষক-শোষিতের সমাজে এই দুই শ্রেণীর সহাবস্থান শান্তির নয়; হিংসাদ্বেষ, সংঘাত-সংঘর্ষ, রেষারেষি ইত্যাদিতে এ সমাজ পরিপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু তাঁর উদার ও বিশাল মনে এ প্রশ্ন ঠাঁই দেননি। সকলকেই তিনি নিজের মনে করে আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন কোনো মানুষই জন্মগতভাবে শোষক-শোষিত নয়; প্রচলিত রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক সিস্টেমের বেড়াজালে ও শিকারে আবদ্ধ হয়ে মানুষের জীবনের গতিপথ নির্ণিত হয় মাত্র। সুতরাং মানুষ দায়ী নয়, সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী। এই চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু প্রচলিত রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে তথা শোষণবাদী সমাজকে ভেঙ্গে শোষণহীন দুর্নীতিমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলার সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বাকশালের পতাকাতলে জড়ো করেছেন। এভাবে বিশেষ করে তথাকথিত শোষক ধনিক সম্ভ্রান্তশ্রেণীকে তাদের মনমানসিকতা পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছেন তবে এ কথাও তিনি জানতেন যে, 'চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী'। এদের মানসিকতা সহজে পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। এরা শিক্ষিত, অতি ধূর্ত, সম্পদশালী ক্ষমতাশালী। এরা তাদের ব্যক্তি বা শ্রেণীস্বার্থের প্রশ্নে খুবই সজাগ এবং এরা পরস্পরভাবে নানা আত্মীয়তার ডোরে আবদ্ধ। এরা সীমাহীন ব্যক্তি ও পরিবারগত সুখ-সম্ভোগ ও প্রাচুর্য্যময় জীবন থেকে একটুও নিচে নামতে রাজী নয়; সমাজের ব্যাপক মানুষের কল্যাণ-শান্তি-সমৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজেদের সামান্যতম স্বার্থ উৎসর্গ করতে রাজী নয়। সমাজের সমষ্টিগত বা ব্যাপক মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন শান্তি-সমৃদ্ধি তাদের কাম্যও নয়।

শোষকগোষ্ঠী সম্পদের লোভ-লালসা ও মোহে অন্ধ। সীমাহীন সুখ শান্তি সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে হেন কোনো পন্থা নেই যা তারা ব্যবহার করে না। নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে এরা রক্তপাত গৃহযুদ্ধ অত্যাচার নির্যাতন প্রতারণা শঠতা হিংসার আশ্রয় নিয়ে থাকে। সমাজের বুকে অবৈধ প্রভাব প্রতিপত্তি, ঠাঁটডাট, শানশওকাত বজায় রাখতে এরা সর্বদা তৎপর। সমাজের আর দশজন সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যতা ও দুর্দশার ভাগ এরা নিতে রাজী নয় বা ঐ সব থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তিও তাদের কাম্য নয়; বরঞ্চ কীভাবে সাধারণ মানুষকে কোণঠাসা করে, দাবিয়ে রেখে তাদের ওপর বাহাদুরি শাসন শোষণ করা যায়; তাদেরকে প্রতারণা ও শঠতার জালে আবদ্ধ করে তাদের শ্রমোপার্জিত সম্পদ অপহরণ করে সমাজের বুকে অর্থসম্পদের ক্ষমতায় নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ করা যায়, এ লক্ষ্যেই চলে তাদের যাবতীয় কার্যক্রম। সুতরাং শোষকশ্রেণী বা সমাজের শতকরা ৫ ভাগ ধনিকগোষ্ঠী জাতীয় দল বাকশাল বা দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে বিশ্বাসী নয়। তাই হয় তাদেরকে তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষের ভাগ্যকে নিজেদের ভাগ্যের সাথে মেশাতে হবে, অথবা তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে উচ্ছেদের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাকশাল ব্যবস্থার মধ্যে এ জাতীয় কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কারণ সমাজের মাত্র ৫% ভাগ ভাগ্যবান ধনিক শোষকদের স্বেচ্ছাচারিতার ওপর শতকরা ৯৫ ভাগ সাধারণ মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে চিনিমিনি খেলা বা ধ্বংস করার পথে ছেড়ে দেয়া যায় না।

বঙ্গবন্ধু সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে ব্যক্তিস্বেচ্ছাচারিতা-স্বৈরাচার, ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিভাগ্যোন্নয়নের বা ব্যক্তিসম্পদের সীমাহীন উদগ্রলোভ-লালসার যূপকাষ্ঠে যাতে সমাজের বৃহত্তর সংখ্যা-গরিষ্ঠ সাধারণ দীনহীন শ্রমজীবি মেহনতী মানুষের জীবনের আশা-আকাংখা, স্বপ্নসাধ ও তাদের মৌলিক মানবাধিকার বলি না হয়, তাদের রাজনৈতিক অধিকার খর্বিত না হয়, তারা স্বৈরতান্ত্রিক শাসন শোষণে পতিত না হয়, সেই ব্যবস্থাই নিয়েছিলেন বাকশাল কর্মসূচীর মধ্যে। সুতরাং বাকশাল ব্যবস্থার মধ্যে কোনো ব্যক্তি-গোষ্ঠী বিশেষের শাসন ও ভাগ্যোন্নয়নের কোনোই অবকাশ নেই। এখানে একক ব্যক্তি-গোষ্ঠী বিশেষের একচেটিয়া নেতৃত্ব ও প্রভাব প্রতিষ্ঠারও সুযোগ নেই। বাকশাল বিভিন্ন পেশাভিত্তিক জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল যৌথ-নেতৃত্বের রাজনৈতিক প্লাটফরম। এই প্লাটফরম থেকে আগত সরকারও হবে পেশাভিত্তিক জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, গণতান্ত্রিক সরকার, যার লক্ষ্য একটি শোষণহীন দুর্নীতিমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণ।

জাতীয় ঐক্যই বাকশালের প্রধানতম হাতিয়ার। জাতীয় ঐক্যের বলে বলিয়ান হয়ে আমরা যেমন আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে এনেছিলাম, ঠিক

একইভাবে স্বাধীনতাকে জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে সংহত ও অর্থবহ করে তোলার বিপ্লবে ঐ জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য। আর জাতীয় আর্থসামাজিক মুক্তি ও সমৃদ্ধি কেবলমাত্র সাম্যবাদের মধ্য দিয়েই অর্জিত হতে পারে; অন্য কোনো পথে নয়। সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেক কর্মক্ষম মানুষ তার সামর্থানুযায়ী বা যোগ্যতানুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজনানুযায়ী প্রাপ্য পাবে।

সাম্যবাদী সমাজে মুনাফা সৃষ্টির কোনো অবকাশ নেই। 'মুনাফা' হলো ব্যক্তিমালিকানাধীন ক্ষেত্রের যাবতীয় ব্যয় মিটিয়ে যে লভ্যাংশ বেরিয়ে আসে সেটাই মুনাফা এবং স্বত্ত্বাধিকারী হলো ব্যক্তিবিশেষ বা মালিক বা মুনাফা অর্জনকারী ক্ষেত্রের মালিক। কিন্তু সমষ্টিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রের যা কিছু মুনাফা ফসল লাভ, তার মালিক উৎপাদন কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী সমষ্টিগত জনগোষ্ঠী। অর্থাৎ সমষ্টিগত মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন—মৌলিক মানবাধিকার একমাত্র সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভব, অন্য কোনো পথে নয়।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, সাম্যবাদের জাতশত্রু আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দেশীয় সেবাদাস, এজেন্ট, একচেটিয়া পুঁজিপতি-শিল্পপতি, উঠতি ধনিক শোষকগোষ্ঠী ও তাদের সহায়তাকারী রাজনীতিক-আমলা-জেনারেল ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবাদীচক্র সমাজের ক্ষমতার মূল কেন্দ্রে। রাষ্ট্রীয় আইন কানুন প্রশাসন, সামরিক শক্তি ধর্ম ও সম্পদ তাদের নিয়ন্ত্রণে যাবতীয় প্রচার মাধ্যমও তাদের নিয়ন্ত্রণে। যে কোনো কৌশল অবলম্বন করে তারা জনচেতনা জাগরর্ণ, সামাজিক বিপ্লব তথা সাম্যবাদকে প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং এরাই হলো সাম্যবাদের বিরুদ্ধশক্তি। এই বিরুদ্ধশক্তি বা শোষক প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শক্তিকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার একমাত্র কার্যকরি হাতিয়ার হচ্ছে বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবি মেহনতী শোষিত মানবগোষ্ঠীর ইস্পাতকঠিন ঐক্য। আর এই জাতীয় ঐক্য কেবলমাত্র তাদের সমষ্টিগত কল্যাণভিত্তিক একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক প্লাটফরম বা সংগঠনের মাধ্যমে সংহত ও নিশ্চিত হতে পারে। বাকশাল হলো এই জাতীয় ঐক্য বিনির্মাণের সেই কার্যকরি রাজনৈতিক প্লাটফরম।

এ ব্যতীত সমষ্টিগত মানুষের প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার শাসন ও আর্থসামজিক কল্যাণও নির্ভর করে ঐক্যভিত্তিক কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। যেমন, আমাদের বাঙ্গালী সমাজের অবলুপ্তপ্রায় একান্নবর্তী বা যৌথপরিবার ব্যবস্থা আদিম সাম্যবাদী সমাজের চিন্তাচেতনা ও ধ্যানধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিলো। এর মূলে ছিলো পারিবারিক ঐক্য ও সহমর্মিতাবোধ। সেই সামাজিক ব্যবস্থার নানান বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকে আমরা যে সমাজ ব্যবস্থায় বসবাস করছি সেই সমাজব্যবস্থার মধ্যে এখনো সাবেক একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবার ব্যবস্থার রেশ

ক্ষুদ্রায়তনে বিরাজ করছে; জাতিগত, সাম্প্রদায়িক, গোষ্ঠী বা শ্রেণীগতভাবে আমরা কেবল যার যার স্বার্থে বিভক্ত হয়ে পড়েছি মাত্র। তাই বৃহত্তর বাঙ্গালী জাতিকে একটি পারিবারিক ঐক্য সম্প্রীতির দর্শন-কাঠোমায় নিয়ে আসতে হলে সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থকে সর্বাগ্রে বিসর্জন দিতে হবে। যেমন আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিতে পেরেছিলাম জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে।

আমরা বাঙ্গালী এমন একটি জাতি, যে জাতির মানুষগুলো পরস্পরের সাথে যে কোনোভাবেই হোক আত্মীয়তা ও সহমর্মিতায় আবদ্ধ। যার ফলে মোটামুটি আমাদের চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা, আশা-আকাংখা-আমাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্পকলা কৃষ্টি ও মানস্প্রবৃত্তি একটি অভিন্ন ধারায় আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। বাঙ্গালী এমনি একটি আবেগপ্রবণ ও বৃহৎ মনের অধিকারী জাতি, যার ফলশ্রুতিতে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি সহমর্মিতা সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য গড়ে উঠতে সময় লাগে না। যদিও এই বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়, ধনী দরিদ্র তথা শ্রেণী বিদ্যমান; শোষক শোষিত সমাজের বুকে বসবাস করছে, তবুও বাঙ্গালী বৃহত্তর জাতিগত স্বার্থে হৃদয় দিয়ে তাড়িত হয় সহজে। তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে, ভুলে যায় ধর্ম ও শ্রেণীর ভেদাভেদ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধও পূর্বাপর আন্দোলন—সংগ্রামই এ কথার প্রমাণ বহন করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনের বিরুদ্ধে হাজী শরিয়তউল্লাহ, দুদুমিয়া, তিতুমীর, ফকির মজনুশাহ প্রমুখ বিপ্লবীদের নেতৃত্বে কৃষক সাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কাহিনী শুনেছি। ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে মূলতঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইস্পাত কঠিন ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসও আমরা দেখেছি। এ ব্যতীত সুভাষ চন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, শরৎচন্দ্র বসু, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল কাশেম ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙ্গালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে আমরা দেখেছি। ঐক্যবদ্ধ জাতির সংগ্রাম কোনোকালে কোনো যুগে ব্যর্থ হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না।

জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে চাই সঠিক গতিশীল নিবেদিতপ্রাণ নেতৃত্ব। আর নেতৃত্বের অভাবেও জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। মহামতি লেনিন, মাওসেতুং, হোচিমিন, যোশেফ ব্রোজ টিটো, কিম ইল সু, ফিডেল ক্যাস্ট্রোসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতৃত্বের সঠিকতা-দূরদর্শিতার ফলে সামন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ নয়া-উপনিবেশবাদ পুঁজিবাদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও বল্গাহীন শোষণ থেকে ঐ সব দেশের জনগণ মুক্তিলাভ করেছে। এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয়েছে। তেমনি এর জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে। বঙ্গবন্ধুর গতিশীল

নিরবচ্ছিন্ন আপোষহীন সঠিক নেতৃত্বের ফলশ্রুতিতে বাঙ্গালী জাতি ধর্মের প্রাচীর ভেঙে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে, জাতীয় ইস্পাতকঠিন ঐক্যশক্তিতে বলিয়ান হয়ে পাকিস্তানী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-শোষণ এবং বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জীবনপণ লড়াইয়ে জয়লাভ করেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীর প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক মুক্তি তথা একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বাকশাল কর্মসূচি প্রদান করেছেন। তার মধ্যে জাতীয় ঐক্যকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কারণ তিনি নিজ অভিজ্ঞতায় দেখেছেন বহুদলীয় তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিণতি ও মুক্ত অর্থনীতির কর্মকান্ডের ফল এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোনো প্রকারেই সমষ্টিগত বা ব্যাপক মানুষের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক মুক্তি আসতে পারে না। এ কারণেই তিনি জাতীয় ভিত্তিক একক রাজনৈতিক প্লাটফরম সৃষ্টি করে বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত দীনদুখী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কার্যকরি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। সুতরাং তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে ফ্রিস্টাইল বা স্বেচ্ছাচার ও সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিপ্রভাব-প্রতিপত্তি এবং অবৈধ উপায়ে সীমাহীন ব্যক্তিসম্পদের পাহাড় গড়ার কোনোই অবকাশ বাকশালে নেই। এ সবই হয়ে থাকে প্রচলিত বহুদলীয় রাজনীতিতে সৃষ্ট তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বদৌলতে। বাকশাল কর্মসূচী প্রদান করে ঐ ব্যবস্থার মূল্যোৎপাটন করা হয়েছে।

'আমরা সকলে পরের তরে' এই নীতিতে সমাজের ব্যাপক মানুষের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আর্থবৈষয়িক সার্বিক ভাগ্যোন্নয়ন করার লক্ষ্যে বাকশাল ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা হয়েছে। অর্থাৎ বাকশাল হলো সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্টার তাত্ত্বিক দর্শন এবং এর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার একমাত্র বিপ্লবী সংগঠন বা প্লাটফরম। এর কার্যক্রমের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে বাংলাদেশে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। ভ্রাতৃত্ববোধ শ্রদ্ধাবোধ ভালোবাসা ও সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে বাঙ্গালী জাতির বৃহত্তর 'পারিবারিক সমাজ'। এটাই হলো বাকশাল কর্মসুচী—দ্বিতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য।

এক্ষণে সঙ্গতকারণেই বাংলার ঐতিহ্যবাহী অতীত যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার সমাজ ব্যবস্থার ওপর যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে।

যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা কোনকাল থেকে বাংলার বুকে চালু হয়েছিলো তা বলা মুশকিল। তবে এ জাতীয় পরিবার ব্যবস্থা আদিম রক্তভিত্তিক কৌম বা উপজাতীয় সমাজের ভাবধারায় গড়ে উঠেছিলো বলে আমাদের মনে হয়। যৌথপরিবার ব্যবস্থাও রক্তের বন্ধনে একটি বংশ বা গোত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো; তার প্রমাণ ক্ষীণ অবস্থায় আজো গ্রামবাংলায় দেখতে পাওয়া

যায়। যৌথ পরিবার ব্যবস্থার সূত্রপাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমাদের মনে হয় যে, গ্রামবাংলার প্রাচীন 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমবায়' ব্যবস্থার যুগের মতোই ছিলো যৌথ পরিবার ব্যবস্থার অবস্থান। অথবা বলা যেতে পারে, প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমবায় ব্যবস্থার ধ্বংসস্তুপের মধ্য দিয়েই 'যৌথ পরিবার' ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটেছে। তবে বাংলার ঐ ঐতিহ্যবাহী স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমবায় ব্যবস্থা স্মরণাতীতকাল থেকে শুরু করে একেবারে হাল আমলের ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ক্ষীণ হয়ে টিকে ছিলো।

উনবিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে প্রখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক রাজপুরুষ চার্লস্ মেটক্যাফ উপমহাদেশের গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে লিখেছিলেনঃ "গ্রাম সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে ছোটো ছোটো প্রজাতন্ত্র। তাদের যা কিছু প্রায়োজন সবকিছুই তাদের আছে, গ্রামের বাইরে কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে। পৃথিবীতে সবকিছুই যেখানে নশ্বর, সেখানে এগুলো যেনো চিরস্থায়ী। একের পর এক রাজবংশ ও শাসন ব্যবস্থার পতন হয়েছে। বিপ্লবের পর বিপ্লব সংঘটিত হয়, হিন্দু পাঠান মোগল মারাঠা শিখ ইংরেজরা ক্রমান্বয়ে একের পর এক রাজক্ষমতা দখল করে—তবুও গ্রামসম্প্রদায়গুলো অপরিবর্তিত থেকে যায়। যদি কখনো তারা লুটতরাজ ও ধ্বংসকার্যের শিকার হয়ে পড়ে, আক্রমণকারী শক্তি যদি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে তাহলে তারা নিকটবর্তী কোনো বন্ধুগ্রামে পালিয়ে যায়। ঝড় বয়ে যাওয়ার পর আবার তারা ফিরে এসে নিজেদের কাজকর্ম শুরু করে। যদিও লুটতরাজ ও হত্যাকান্ড কয়েক বছর জুড়ে চলে তবুও শান্তি স্থাপনের পর গ্রামবাসী ফিরে আসে ......।"

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, ঐ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমবায় ব্যবস্থা হয় একটি বৃহৎ বংশসমন্বয়ে বা একাধিক বংশ বা গোত্রসমন্বয়ে একক পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো। অর্থাৎ আদিম সাম্যবাদী কৌম সমাজকেই এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে পড়ে।

অতীত যৌথপরিবার সমাজের পরিবারের সকল কর্মক্ষম নারী পুরুষ একটি অভিন্ন মঙ্গলাদর্শে উজ্জীবিত হয়ে যে যেভাবে পারতো উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যার যার যোগ্যতানুযায়ী শ্রম প্রদান করতো এবং তাদের উৎপাদিত ফসল পরিবারের যৌথ তহবিলে জমা হতো। পরিবার সর্দার বা প্রধানকর্তা প্রত্যেকটি সদস্য সদস্যার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সকলে মৌলিক চাহিদা পূরণ করতো। কর্ম অক্ষমদের কোনোমতেই অবহেলা ও বঞ্চিত করা হতো না। আত্মীয়তা ও সহমর্মিতার কারণে তাদেরকেও অন্যান্য সকলের মতো সম-অধিকার প্রদান করা হতো। পরিবার প্রধান ও অন্যান্য শাখাপ্রধানরা পরিবারের সচেতন সকলে সর্বসম্মত রায়ে মনোনীত হতো। পরিবারের কোনো সদস্যের ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদ

থাকতো না। সবকিছুই ছিলো যৌথ মালিকানায়। অর্থাৎ পরিবার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকবোধ ও আর্থবৈষয়িক সাম্যতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিলো। এটাই বাংলার নিকটাতীতের সমৃদ্ধশালী সাম্যবাদী ব্যবস্থার নিদর্শন। হাজী শরিয়তউল্লাহ, পীর দুদুমিয়া, ফকির মজনুশাহ, তিতুমীর প্রমুখ বিপ্লবী পুরুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিলো আরো গতিশীল ও বৈপ্লবিক। অর্থাৎ ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে বৃহত্তর সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্টার আন্দোলন। সুতরাং বাংলার ইতিহাসের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ভাস্বর হয়ে আছে সাম্যবাদের নিদর্শন। এ ব্যতীত আমাদের প্রতিটি বাঙ্গালী সংসার-পরিবারে--একক বা যৌথ উপার্জনশীল সংসারে সাম্যবাদী আর্থব্যবস্থার কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পালিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু বাংলার ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার, বাংলার সাম্যবাদী বিপ্লবীদের কার্যক্রম, ইসলাম ও মার্কসবাদ এবং নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তাচেতনার আলোকে বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি জাতীয় সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক কর্মসূচী প্রদান করেছেন; এ কথাটাই আমাদের সর্বাগ্রে স্মরণ রাখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর একটি উক্তি উল্লেখ করতে হয়। ১৯৭৩ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটি ছাত্রযুবক সমাবেশে ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন—'আমি চাই ন্যায় বিচার—ইনসাফ। আমি চাই শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ। চাই উমরি শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা।' হযরত উমরকে টেনে এনে প্রকারান্তরে তিনি ইসলামের খেলাফতে রাশেদীনের কথাই বলতে চেয়েছেন। কারণ ইসলামের প্রকৃত গণতান্ত্রিক সাম্যবাদী ব্যবস্থা হযরত উমরের শাসনামলেই পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিলো। তিনিই সর্ব প্রথম শোষণের প্রধানতম হাতিয়ার ভূমি ব্যবস্থাকে তথা উৎপাদন ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করে জনগণের মালিকানায় পর্যবশিত করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। খেলাফত শাসিত অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ (মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে) রেশনিং প্রথায় বায়তুলমাল থেকে খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী পেতো। স্বয়ং খলিফাও একইভাবে সব কিছু গ্রহণ করতেন। খলিফা বা খলিফার মনোনীত প্রতিনিধিরা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্যে কোনো বেতন-ভাতাদি পেতেন না। খেলাফতের কোনো কর্মশালা মহাসদন বা সচিবালয় ও আমলা বাহিনী ছিলো না। ছিলো না স্থায়ী বেতনভুক কোনো সৈন্য বাহিনী। আপাতকালীন বা জরুরী ভিত্তিতে বা আভ্যন্তরীণ বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে স্বেচ্ছাসেবী আনসার বা জনগণের সমন্বয়ে স্বেচ্ছাভিত্তিক সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠতো। শান্তি শৃংঙ্খলা স্থাপনের পর আপনা-আপনি তা বিলুপ্ত হয়ে যেতো। খলিফা ও প্রতিনিধিরা সকলের সর্বসম্মতিক্রমে বা ভোটে নির্বাচিত হতেন। সমাজে প্রভু দাস

বলতে কিছুই ছিলো না। ক্রীতদাস বেলালকে মুক্ত করে এনে মহানবী তাকে প্রথম মোয়াজ্জিন পদে নিয়োগ করেছিলেন। মানুষের মধ্যে কোনো শ্রেণী ছিলো না। খলিফা উমরের জেরুজালেমের পথে তাঁর উঠের চালকের সাথে পালাক্রমে উঠের পিঠে সওয়ার হওয়ার কাহিনীও আমরা জানি। এ ব্যতীত দুঃস্থ রুগ্ন দরিদ্র-অনাহারী পরিবারে খলিফা উমর স্বয়ং নিজে কাঁধে করে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিতেন। নিজপুত্রের অপরাধের কঠিন শাস্তি তিনি নিজ হাতে দিয়েছিলেন, কোনো দ্বিধা সংকোচ করেননি। দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর পরিবারের সদস্যরা বায়তুলমাল থেকে অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে আসার জন্যে অনুরোধ করলে উমর তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—'বায়তুলমাল জনগণের, আমার নয়; অতিরিক্ত গ্রহণ করা আমার অন্যায়।' এ ব্যতীত হযরত উমর প্রায়শঃই বলতেন 'সুদূর ফোরাতের কূলে একটি কুকুরও যদি না খেতে পেরে মারা যায় তার জন্যে আমাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি হতে হবে।'

এ ব্যতীত দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগের কালে জনগণের জীবন বাঁচানোর জন্যে হযরত উমর সমস্ত শরিয়াতি আইন-কানুন স্থগিত রেখেছিলেন। চুরি বা চৌর্যবৃত্তির অপরাধে হস্তকর্তনের বিধান তিনি বাতিলও করে দিয়েছিলেন।

এভাবেই সাম্যবাদী ব্যবস্থার বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই খেলাফতে রাশেদীনের মধ্যে। উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধু ইসলামের একদলীয় খেলাফত ব্যবস্থার মতো বাঙ্গালী জাতির একক জাতীয় দল বাকশালের রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও আর্থসামাজিক কর্মসূচী প্রদান করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রচলিত বহুদলীয় রাজনীতির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলতঃ মুষ্টিমেয় ধনিক শোষক সুবিধাবাদী তথা কায়েমী স্বার্থান্বেষী চক্রের শাসন শোষণকার্য বাধ্যবাধকতাহীন বা ফ্রিস্টাইলভাবে চালিয়ে যাওয়ার কার্যকরি হাতিয়ার। এ জাতীয় বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আধুনিক ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী সমাজ রাষ্ট্রসমূহে একটি আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিশেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। ইংরেজ শাসক-শোষকগোষ্ঠী ওয়েস্টমিনিষ্টার ধাঁচের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন, তার মধ্যে মূল লক্ষ্য ছিলো শোষণ ও বহুদলীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ফলে যাতে বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ অজ্ঞ দুর্বল শোষিত মেহনতী শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। কারণ শ্রমজীবি শোষিতের ঐক্যের মধ্যেই শোষক সমাজের মৃত্যুবাণ নিহিত। বৃটিশ বাণিজ্যিক পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগোষ্ঠী শাসিত সাম্রাজ্যবাদের এই বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের আশ্রিত উপনিবেশগুলোর উঠতি শোষক ধনিক গোষ্ঠীকেও আকৃষ্ট করে। ফলে এই সমস্ত অঞ্চলে বা দেশে ব্যাঙ্গের ছাতার মতো বহুদলীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলো গড়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতাও মদতের যুপকাষ্ঠে। কারণ এ সমস্ত অঞ্চল বা

দেশের মেহনতী শোষিত মানবগোষ্ঠী ধীরে ধীরে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলো। তাদের জাগ্রত চেতনা যাতে ভবিষ্যতে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বা বিপ্লবের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের অনুচর ও সেবাদাসদের দিয়ে বহুদলীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে শোষিত মেহনতী মানবগোষ্ঠীকে বিভক্ত করে রাখার পন্থা অবলম্বন করে। এবং এই সব রাজনৈতিক দলসমূহকে মোটা অংকের চাঁদা দিয়ে থাকে। এর মূলে সাম্রাজ্যবাদ আরেকটি লক্ষ্য হাসিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে, সেটি হলো কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রকে প্রতিরোধকরণ। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ কীভাবে কমিউনিজমকে প্রতিরোধ করার জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে তার সুন্দর বিবরণ রয়েছে প্রখ্যাত 'রেড চায়না' গ্রন্থে। বর্ণিত আছে যে, 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কমিউনিজমকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে নানাভাবে যে বিপুল অর্থ অপব্যয় করে থাকে, সেই অর্থের একটি অংশও যদি উন্নয়নশীল দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হতো তাহলে কমিউনিজমের নামগন্ধ থাকতো না।' কিন্তু তারা এ পথ অবলম্বন না করে যে ভাবে প্রতিনিয়ত কমিউনিজমের জুজুর ভয় প্রচার করছে এবং তা প্রতিহত করার জন্যে নানান সন্ত্রাসবাদী ও অন্তর্ঘাতমূলক এবং নির্যাতনমূলক কর্মকান্ড দেশে দেশে চালিয়ে যাচ্ছে, নানান অপকর্মে ঢালাওভাবে অর্থ অপব্যয় করছে; মেহনতী মানবগোষ্ঠীকে শোষণ করছে, তাতে করে দেশে দেশে কমিউনিজম বিপ্লবই ত্বরান্বিত হচ্ছে। যতো ক্রুদ্ধভাবে তারা কমিউনিজমের ওপর আঘাত হানছে ততোটুকু গতিতে কমিউনিজম এগিয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের একটি থিয়োরী প্রণিধানযোগ্য যথা ঃ 'Every action has got its own equal and opposite reaction'.

মেহনতী শোষিত মানুষের মধ্যে যেমন কোনো শ্রেণী নেই, তদ্রুপ শোষক সমাজে শোষকের মধ্যেও তেমনি কোনো শ্রেণী নেই। দেশকাল-অঞ্চলভেদে শোষিত মানুষের মধ্যে যেমন কোনো পার্থক্য নেই তেমনি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসক-শোষক বা উপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক দেশের শাসক-শোষকের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই; একে অপরের স্বার্থের ঘুঁটি হিশেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমান উন্নত ও উন্নয়নশীল যে সকল রাষ্ট্রে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার তথাকথিত গনতন্ত্র প্রচলিত আছে তা শোষক ধনিক সমাজের স্বার্থকেই মূলতঃ রক্ষা করে চলেছে। ফলে এ সকল রাষ্ট্রের মেহনতী শোষিত মানবগোষ্ঠী বহুদলীয় রাজনীতির টানাপোড়েনের গোলক ধাঁধায় নিপতিত হয়ে নানান দলের নেতৃত্বে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বিশ্বে নানান ধরনের তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যেমনঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন, সংসদীয় শাসন, রাজতান্ত্রিক ও সামরিক শাসন। এ সকল শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে মূলতঃ

সংহত হচ্ছে ধনিক-কায়েমী স্বার্থন্বেষী শ্রেণীর একচেটিয়া শাসন-শোষণ ও প্রভাবপ্রতিপত্তি। তবে এ সব দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে শ্রমজীবি মেহনতী শোষিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে প্রগতিশীল বামপন্থী বা সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলও পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও রয়েছে নানা মত-পার্থক্য বা তাত্ত্বিক কোন্দল। ফলে একই সময়ে সমাজতন্ত্রের নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে থাকে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে শোষিত মেহনতী মানবগোষ্ঠী নানান বিভ্রান্তিতে ভোগে। মুক্তির লক্ষ্য সকলের এক হলেও বহুদলীয় রাজনীতির খপ্পরে পড়ে তারা মুক্তির পথ হারিয়ে ফেলে; তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে শোষিত মেহনতী মানুষের একক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে পারে না, পারে না তারা রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতায় আরোহন করতে।

অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক বা বামপন্থী পার্টিসমূহের নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে এ সব পার্টির নেতৃত্ব সমাজতন্ত্রের নামে জান কোরবান করার বুলি আউড়ে থাকলেও এদের চলাফেরা, আচার, ব্যবহার, আচরণ, শানশওকাত ও কার্যকলাপ দেখে সন্দেহ করার অনেক কারণ রয়েছে যে, এরা মূলতঃ সমাজতন্ত্রী কিনা। সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিক শোষকগোষ্ঠীর এজেন্ট কিনা। কারণ শোষকরা তাদের স্বার্থে সমাজতন্ত্রের নাম ভাঙ্গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তাদের সেবাদাস রাজনৈতিক টাউট নেতাদের দিয়ে রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে থাকে এবং এসব দলনেতারা সমাজতন্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে নানান হঠকারী ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে সমাজতন্ত্রকে সন্ত্রাসবাদ হিশেবে চিহ্নিত করে সাধারণ শোষিত মেহনতী মানুষকে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি, আবদুল হক, তোয়াহা, নগেন, মতিন, আলাউদ্দিন, টিপু, কাজী জাফর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সাম্যবাদী রাজনীতির নামে যে সব সন্ত্রাসবাদী অন্তর্ঘাতমূলক গণবিরোধী ও হত্যার রাজনীতি চালিয়ে এসেছেন তাতে করে সাম্যবাদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা আরো ঘোলাটে হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের কার্যকলাপেই তারা প্রমাণ করেছেন যে তারা সত্যিকারের সাম্যবাদী নন। তাই এ সব নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে যদি বলা হয় যে, তারা সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় পুঁজিবাদের পেইড এজেন্ট তথা 'পেন্টাগনপন্থী কমিউনিষ্ট' তাহলে বোধকরি সত্যের অপলাপ করা হবে না। সুতরাং এ জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের রাজনীতির হোলিখেলা দেখে নিরূপন করা সত্যিই দূরুহ যে কারা প্রকৃত সমাজতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্র মূলতঃ কী!

প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ট দরিদ্র মেহনতী শোষিত মানবগোষ্ঠী কেবলমাত্র প্রতিনিধি বা শাসক নির্বাচনের একটা ভোটাধিকার প্রয়োগের

সুযোগ পেয়ে থাকে মাত্র। বহুদলীয় নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় মূলতঃ বিপুল অর্থই প্রার্থীর জয়লাভকে নির্ধারণ করে থাকে। সে ক্ষেত্রে বিত্তহীন সাধারণ দরিদ্র জনসাধারণ বা তাদের প্রতিনিধি অর্থের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে একেবারেই অক্ষম। অপরদিকে যাবতীয় জাতীয় নির্বাচন হয়ে থাকে বিভিন্ন দলভিত্তিক প্রতিযোগিতার মাধ্যম। দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে কোনো দলের মনোনয়নই পাওয়া ভার, কারণ অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তার দলের তহবিলে ও নেতাকে বিপুল পরিমাণ চাঁদা বা ঘুষও দিতে হয়, নইলে দলের মনোনয়ন পাওয়া দুষ্কর। তাই দরিদ্র লোকের পক্ষে নির্বাচনীয় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তারা শুধু পারে ভোট দিতে, বিক্রয় করতে যা অনিবার্যভাবে চলে যায় বিত্তশালী প্রভাবশালী প্রার্থীর পক্ষে। অনেক সময় তারা তাদের ভোট দিতেও পারে না; ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগেই দেখা যায় যে তাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে। আবার অধিকাংশ দিনমজুর বা ভোটারদের একটা বিরাট অংশ নির্বাচনে ভোট দিতে কেন্দ্রেও উপস্থিত হয় না, তাদেরকে পেটের ধান্দায়ই ব্যস্ত থাকতে হয়; কিন্তু দেখা যায় যে অনুপস্থিত ভোটারদের ভোটও প্রভাবশালী প্রার্থীর পক্ষে দেয়া হয়ে গেছে। এ ব্যতীত অন্যান্য জালিয়াতি ও কারচুপি তো হয়ে থাকেই।

সুতরাং বিভিন্ন রাজনৈতিক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা নির্বাচনে জয়লাভ করলে দেখা যাবে যারা নির্বাচিত হয়ে আইন ও প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হলেন তারা প্রায় সকলেই ধনিকশ্রেণী থেকে আগত। তাই স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রীয় আইন কানুন প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সবকিছু তাদেরই স্বার্থে গড়ে ওঠে এবং ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটাই হলো পুঁজিবাদী বা বহুদলীয় গণতন্ত্রের অনিবার্য ফলশ্রুতি। ফলে এখানে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আর্থসামাজিক নিরাপত্তার কোনোই নিশ্চয়তা নেই। এখানে শাসন ক্ষমতা যেমন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে তেমনি আর্থ-বৈষয়িক-সামাজিক- সাংস্কৃতিক-শিক্ষানীতি ও এর গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে তাদেরই হাতে। সুতরাং প্রচলিত তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বদৌলতে ধনিকগোষ্ঠী আরো ধনী হচ্ছে, শোষিত দরিদ্র জনসাধারণ আরো শোষিত-নিঃস্ব হচ্ছে; সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় মানুষের শাসন শোষণ ও প্রতিপত্তির অবকাশ নেই। কারণ ব্যাপক সাধারণ জনগণের শাসন ও তাদের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিতকরণই সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য—এ সমাজে শোষকগোষ্ঠীকে, কায়েমী স্বার্থবাদী সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিকভাবে উচ্ছেদ সাধন করা হয়ে থাকে।

বঙ্গবন্ধু তাই বহুদলীয় প্রতারণামূলক রাজনীতি বা মুষ্টিমেয় শোষক ধনিক শ্রেণীর গণতন্ত্রের জট ভেঙ্গে দিয়ে বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মেহনতী দরিদ্র

শোষিত মানবগোষ্ঠীকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও তাদের আর্থবৈষয়িক সার্বিক কল্যাণ-তথা শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাম্যবাদী কর্মসূচী প্রদান করেছিলেন বাকশাল ব্যবস্থার উদ্ভাবন ঘটিয়ে।

বাকশাল ব্যবস্থায় জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এবং যাতে প্রতিটি নির্বাচনে সমস্ত ভোটাররা ভোটপ্রদান এবং তাদের পেশাভিত্তিক প্রতিনিধিরা নির্বাচনে প্রার্থী হিশেবে প্রতিযোগিতা করতে পারে তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বিভিন্ন পেশাভিত্তিক জনপ্রতিনিধিরা যাতে শাসন ক্ষমতায় ও অন্যান্য পরিচালনা পরিষদে যেতে পারে তার জন্যে স্থানীয় গ্রাম সমবায়, থানা পরিষদ ও অন্যান্য জাতীয় নির্বাচনে প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় দল বাকশাল একই আসনে একাধিক প্রার্থীকে মনোয়ন দেবে। ফলশ্রুতিতে নির্বাচন প্রতিযোগিতায় অধিকতর যোগ্য প্রার্থীরা অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় যথা প্রার্থীর প্রচার-পরিচিতি ইত্যাদি ক্ষেত্রের ব্যয় বহন করবে। কোনো প্রার্থীই প্রকাশ্যে বা গোপনে অর্থ দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করলে সেই প্রার্থীর প্রার্থীপদ বাতিল করে দেয়া হবে। তাই অর্থ দিয়ে যাতে ভোটারদের প্রভাবিত করা না হয় তার জন্যে পূর্বাহ্নেই প্রত্যেক প্রার্থীকে তার অর্থের তহবিলের হিশেব দাখিল করতে হবে। জাতীয় দল ও সরকার এ বিষয়ে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এ পদ্ধতিতে কোনো প্রার্থী টাকা-পয়সা ও অন্যান্য প্রভাব খাটিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার সুযোগ পাবে না। তাছাড়া পেশাভিত্তিক নির্বাচনের ফলে প্রার্থীর আয়-উপার্জন ও অর্থের সূত্রের পরিমাপ করা মোটেই দুরুহ নয়। ফলে নির্বাচনে জয়লাভ কেবলমাত্র প্রার্থীর চরিত্র ও সার্বিক যোগ্যতার মাপকাঠিতে নির্ধারিত হবে। এভাবে ক্ষমতার প্রতিটি কেন্দ্রে স্বাভাবিকভাবেই জনগণের বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রকৃত যোগ্য সৎ নিষ্ঠাবান প্রতিনিধিরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যেতে পারবে। এবং এর ফলে বিভিন্ন পরিচালনা পরিষদে ও ক্ষমতার কেন্দ্রে তাদের নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে সবকিছু সরাসরি তাদের অনুকূলে এসে যাবে। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ শতকরা ৮০% ভাগ জনগণের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে যাবে, অর্থাৎ এতোকাল যারা ছিলো শোষিত অবহেলিত নিগৃহীত দুর্বল, তারাই এভাবে ক্ষমতার মূল কেন্দ্রে এসে যাবে। এ ব্যতীত বিভিন্ন পরিষদে পেশাভিত্তিক প্রতিনিধি থাকার ফলে কোনো বিশেষ পেশার প্রাধান্য বা প্রভাব কার্যকর হবে না। তবে এক্ষেত্রে কৃষক শ্রমিক পেশাজীবিদের প্রাধান্য অবশ্যই থাকবে, যেহেতু তারাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এভাবেই প্রকৃত জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই। এটাই হলো বঙ্গবন্ধুর বাকশাল সৃষ্টির মূল লক্ষ্য।

সুতরাং যে সকল মহল বাকশাল ব্যবস্থাকে স্বৈরতান্ত্রিক, একদলীয়, গণতন্ত্র

হত্যাকারী ও ব্যক্তিশাসন প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিশেবে চিহ্নিত করেন এবং নানান কুৎসা ও অপপ্রচার চালান সেই সব মহলকে বাকশাল সৃষ্টির পটভূমিকা ইতিহাস ও পদ্ধতি-প্রক্রিয়া ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে অনুরোধ করি। প্রকৃত কথা হলো, বিরুদ্ধ মহলও জানে যে এ ব্যবস্থা ব্যতীত বৃহত্তর জনগণের সার্বিক কল্যাণ আসতে পারে না। তবুও তারা বাকশালকে গালিগালাজ করেন, নানান অপপ্রচার চালান এই জন্যে যে, তারাই শোষক-প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের এজেন্ট, সেবাদাস, অনুচর। বাকশাল ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে তাদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে যাবে, স্বেচ্ছাচারী-স্বৈরাচারী শাসন-শোষণ প্রভাব ও সুবিধাবাদী কার্যকলাপ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এটাই তাদের ভয়। ফলে তারা আদাজল খেয়ে একযোগে দেশী-বিদেশী প্রভূদের ইংগীতে বাকশালের বিরুদ্ধে গোয়েবলসীয় অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছেন, নানান ষড়যন্ত্রের চোরাগলিতে অবস্থান নিয়েছেন।

তা-ছাড়া একটি ভূমিষ্টমাত্র শিশুকে অপবাদ দিয়ে কী আনন্দ পাওয়া যায় তা আমাদের বোধগম্য নয়। বাকশাল হলো সেই ভূমিষ্ঠমাত্র শিশু। এর পূর্ণ বাস্তবায়ন হতে পারেনি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারী খুনীদের অপকীর্তির ফলে। তাই একে নিয়ে নানান রঙে ঢঙে মাঠ সরগরম করার একটি মাত্রই অর্থ হয়, আর তাহলো নিয়ন্ত্রণহীন ও স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থকে বজায় রাখার ষড়যন্ত্রের মাধ্যম জনগণকে ধোকা দেয়ার অপচেষ্টা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বাকশালকে অপবাদ দিয়ে, গালিগালাজ করে স্বার্থান্বেষী কুচক্রীমহল একদিকে যেমন তাদের শোষক প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীচরিত্রের বৈশিষ্ঠ্যকে উন্মোচন করছেন অপরদিকে জনগণের আশা-আকাংখাকে ধুলিস্মাৎ করার ষড়যন্ত্র করছেন। তাই যারা বাকশালকে গালি দিয়ে এর বিরোধীতা করেন তারা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই স্বার্থকে বিরোধীতা করেন। অতএব বাকশাল বিরোধীরা জনগণের শত্রু।

প্রচলিত বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সৃষ্ঠ তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসন, আর্থসামাজিক, প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যায় যে, এর বদৌলতে বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত শোষিত নিগৃহীত ও প্রতারিত হচ্ছে; নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে। এটাই হলো বহুদলীয় গণতন্ত্র বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলশ্রুতি। এখানে প্রতিক্ষণে দরিদ্র অসহায়ের হাহাকার ও ক্রন্দন রোল নীরবে নির্ভৃতে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখানে কারো প্রতি কারো দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ফুরসৎ নেই, সকলেই নিজ নিজ ব্যক্তিস্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। এ সমাজে অর্থই বড়ো, অর্থই এখানে আত্মীয়তা বন্ধুত্ব-সম্প্রীতি ইত্যাদি সম্পর্ক নির্ণয় করে থাকে। এখানে যে যতোখানি ক্ষমতা পায় তার চেয়েও বেশি সে তার স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করে থাকে। এখানে চলে সীমাহীন ব্যক্তিভাগ্যোন্নয়নের স্বেচ্ছাচার প্রতিযোগিতা। সাধারণ মানুষের ও সমাজের সার্বিক

মঙ্গল কোন পথে আসতে পারে, তা শোষক সমাজের বিবেচ্য বিষয় নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে পড়ে জনগণ বুঝতে পারে না, কে তাদের শত্রু কে তাদের বন্ধু। এই রাজনৈতিক দাবা খেলার গোলক ধাঁধার মারপ্যাচের শিকারে পরিণত হয়ে জনসাধারণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। ফলে তারা বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। তাদের মধ্যে তাই বৃহত্তর ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না, ফলশ্রুতিতে রাজনীতি যেমন কোনো স্থিতিশীল সাংগঠনিক সত্তায় গড়ে উঠতে পারেনি তেমনি রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশও স্থিতিশীলভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। আর এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে শোষকগোষ্ঠী এবং তাদের নিত্যসঙ্গী তাবেদার আমলা-দালাল গোষ্ঠী জনগণের ওপর স্বৈরাচারী শাসন শোষণ ও ত্রাশনের স্টিমরোলার চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনীতির অস্থিতিশীল পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করে প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে জেঁকে বসেছে শক্তিশালী আমলাতন্ত্র এবং আর্থবৈষয়িক ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় শোষক সুবিধাবাদী চক্রের প্রতিযোগিতামূলক কর্মকান্ডে সৃষ্টি হয়েছে মুক্ত অর্থনীতির হোলিখেলা। ফলে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, ক্ষমতা-সুযোগ-সুবিধা-সামরিক বাহিনী, এমন কি দেশের যাবতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অর্থসম্পদ গুটিকতক ধনিক সুবিধাবাদী ক্ষমতালোভী সৌভাগ্যবানদের করায়ত্বে চলে যাচ্ছে। ফলে দেশের কল্যাণকামী রাজনীতিকরা হতাশ হয়ে পড়ছে আমলাতন্ত্র ও মুক্ত অর্থনীতির দৌরাত্ম্য দেখে। আর মাঝখানে সাধারণ মেহনতী শ্রমজীবি মানুষ নীরবদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, যাবতীয় অন্যায় অবিচার শাসন শোষণের শিকারে পরিণত হয়ে ধুকে ধুকে মরছে, ভাগ্যের ওপর নিজেদেরকে সঁপে দিয়ে বসে আছে।

আমলাতন্ত্র ও মুক্ত অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষক প্রবক্তা ধারক-বাহক কারা ? এর উত্তরে বলা যায়ঃ বহুদলীয় রাজনীতির প্রবক্তা, শোষকগোষ্ঠীর এজেন্ট ও রাজনীতিকরাই। কারণ আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও মুক্ত অর্থনীতির বা সম্পদের হোলিখেলায় তারাই অংশগ্রহণ করতে পারে, যাদের পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক শক্তি। আর এদের আগমন ঘটেছে রাজনৈতিক ও আর্থবৈষয়িক দিক থেকে ক্ষমতাশালী ও বিত্তবান পরিবার হতে। তাই এরা একে অপরের স্বার্থে পরিপূরক শক্তি বা এরা একই কায়েমী স্বার্থবাদী সুবিধাবাদী শ্রেণী যারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শক্তির এজেন্ট-সেবাদাস।

এই পরিস্থিতিতে, প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ও আর্থবৈষয়িক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে অক্ষম হয়ে এক শ্রেণীর রাজনীতিকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে চলে গেছেন তথাকথিত আন্ডারগ্রাইন্ডে ও অতিবাম শিবিরে। এরা নিজেদেরকে বিপ্লবী বলে প্রচার করতে ভালোবাসেন। এদের মধ্যেই কেউ আবার অতিবিপ্লবী। এদের লক্ষ্য,

প্রচলিত সবকিছুকে অস্বীকার করা, আঘাত করা, ধ্বংস করা। এরা রক্তপাতমূলক ও হিংসাত্মক পন্থায় ক্ষমতায় যেতে চান। জনগণের মতামত ও ক্ষমতাকে এরা তোয়াক্কা করেন না। ভাবেন 'বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস'। এ দর্শন তারা আমদানী করেছেন চৈনিক হঠকারী অতিবিপ্লবী রাজনীতি থেকে। এরা ক্ষমতাসীন শাসক ও শোষক-ধনিকগোষ্ঠীকে হঠাৎ করে উৎখাত করার জন্যে নানান প্রকার অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা, বিশেষ করে 'জ্বালাও-পোড়াও-মারো' নীতিতে সম্পদ ধ্বংস ও রক্তপাতমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হন। এরা উড়োচিঠি ও টেলিফোনে নানান ভয়ভীতি এবং গলাকেটে জীবননাশের হুমকী দিয়ে ধনীলোকদের নিকট থেকে মোটা অংকের অর্থ অপহরণের কাজে লিপ্ত হন। ফলশ্রুতিতে তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সন্ত্রাসবাদ, দস্যুতা ও হঠকারীতার শামিলে পরিণত হয়েছে। এই তথাকথিত বিপ্লবীদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা জনগণের কাছে সুস্পষ্ঠ তো নয়ই বরং তাদের কাছে এই রাজনীতি গ্রহণযোগ্যও নয়। এর সুযোগ গ্রহণ করে শোষকগোষ্ঠীর এজেন্ট রাজনীতিকরা সমাজতন্ত্রের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে সন্ত্রাসবাদী, ধ্বংসকারী হত্যাকারী ও দস্যুবৃত্তির দর্শন বলে চালিয়ে দিয়ে মানুষকে হতাশার তিমিরে ডুবিয়ে দিয়ে নিজেদের পথকে প্রশস্ত করে চলেছে। ফলে না-খাওয়া দুখী শোষিত মানুষ আজকাল সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের নাম শুনলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা সমাজতন্ত্র বা সামাজিক বিপ্লবকে বুঝতে চায় না, বরং বিরোধীতা করে প্রচলিত শোষক সমাজের রীতিনীতি ও ধর্মের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে নিতে চায়। এভাবেই ঐ তথাকথিত সমাজতন্ত্রী, বিপ্লবী, যাদের শোষক প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের পেইড এজেন্ট বলাই শ্রেয়, তাঁদের হঠকারী কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে তারা সমাজতন্ত্র বা সামাজিক বিপ্লবের পথকে কর্দমাক্ত করেছেন, বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন। তথাকথিত এই বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দেখে জনসাধারণের মনে এ ধারণারই সৃষ্টি হয়েছে যে, যা ভাগ্যে আছে তাই হবে, যা আছে তা-ই থাক; ও সবের মধ্যে যেয়ে লাভ নেই! ফলে তারা হাত-পা গুটিয়ে শোষকসমাজের কার্যকরি দাওয়াই 'ভাগ্যের লিখন'কেই মেনে নেয়। কোন সংগ্রাম-আন্দোলন-বিপ্লব নয়; শান্তিপূর্ণ উপায়ে তারা তাদের অধিকার পেতে চায়।

কিন্তু শোষকসমাজে যে শান্তি নেই, পুঁজিবাদী শোষক সমাজই যে শান্তি হননের সমাজ এবং এ সমাজে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যে শোষিত মেহনতী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, এই সহজ কথাটা ঐ সব একচেটিয়া চিহ্নিত সমাজতন্ত্রী-বিপ্লবীরা জনসাধারণকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন। জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন না করে, প্রচলিত পুঁজিবাদী ও আধাসামন্তবাদী সমাজে তারা প্রকৃতই কী পাচ্ছে, সে বিষয়ে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ না করে তাদের পক্ষে যতোই শ্লোগান ও সমবেদনা বা প্রচেষ্টা চালানো হোক না কেনো তাতে তারা সাড়া

দেয় না, এ কথাটাও এ সব তথাকথিত বিপ্লবীরা বুঝতে চান না। এ অবস্থায় জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে বিপ্লবীরা যে কার্যকলাপে লিপ্ত হন তাতে তাদের কার্যকলাপ সমাজে প্রতিবিপ্লবী কার্যক্রমে পর্যবশিত হয়ে পড়ে; প্রকারান্তরে এর ফলে সামাজিক পরিবেশ শোষক প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের পক্ষে, তাদেরই স্বার্থে চলে যায়।

তাই আমাদের দেশের তথাকথিত বিপ্লবীদের ক্রিয়াকান্ড বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, এরা সমাজতান্ত্রিক সামাজিক বিপ্লব সম্পর্কে যেমন কোন শিক্ষা নিতে পারেননি তেমনি পারেননি জনগণের মনমানসিকতা ও সামাজিক পরিবেশগত পরিস্থিতিকে বুঝতে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য হলো বিশৃঙ্খলা ও রক্তাক্ত কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে রাতারাতি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং নিজেদের শাসন শোষণ প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা, তাতে জনগণের অবস্থা যা-ই হোক না কেনো। পুঁজিবাদী শোষক সমাজের ধারক বাহকদের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার সাথে এ প্রক্রিয়ার তথাকথিত বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার মিল রয়েছে বলে বিজ্ঞমহল মনে করেন। যেহেতু সাধারণ মেহনতী শোষিত মানুষ মুক্তি পেতে চায় সেহেতু তাদের মুক্তির গালভরা শ্লোগান দিয়ে, সমাজতন্ত্রের নামাবলী জড়িয়ে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তারা ক্ষমতার কেন্দ্রে যেতে চান। এই হঠকারী অতিবিপ্লবী, রাতারাতি ক্ষমতায় আরোহণকারী বিপ্লবীদের তাই শোষকশ্রেণীর ছদ্মবেশী এজেন্ট বলাই শ্রেয়। ঐ সব বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা দিনের বেলায় সমাজতন্ত্রের জন্যে মাঠ গরম করেন, জান কোরবান করেন এবং রাতের বেলায় ধনিক শোষক শাসকদের সঙ্গী হয়ে লাল-নীল সুরা ও অন্যান্য আসক্তি নিয়ে মৌজ করেন। ঐ সব সমাজতন্ত্রীদের 'পেন্টাগণপন্থী কমিউনিষ্ট' হিশেবে আখ্যায়িত করাই যুক্তিযুক্ত।

প্রকৃতই সমাজতান্ত্রিক সামাজিক বিপ্লব কি ও এর গতিপ্রকৃতি উদ্দেশ্য লক্ষ্য কি এবং বিপ্লবী কারা ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্টই বা কি, এসব সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনা-ধ্যানধারণা কি, সে বিষয়ে এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ব্যতীত আমাদের দেশের তথাকথিত একচেটিয়া সমাজতন্ত্রীরা জনসাধারণকে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে শোষক ও তাদের দালালগোষ্ঠী জনসাধারণকে এ বলে বুঝিয়ে থাকে যে, সমাজতন্ত্র মানে রক্তাক্ত সংগ্রাম—সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, কারো কোনোই স্বাধীনতা থাকে না; ধর্ম ও গণতন্ত্র বলতে কিছু থাকে না, কারো কোনো ব্যক্তিসম্পদ থাকে না' সবকিছু জাতীয়করণ করে সমাজতন্ত্রীরা তাদের হাতে নিয়ে যাবে; সমাজতন্ত্রীদের স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ইত্যাদি। 'কারো

কোনো ব্যক্তিসম্পদ থাকে না'—এ কথাটাই বিরুদ্ধবাদীরা জোরেশোরে প্রচার করে থাকে কারণ সম্পদ হারানোর ভয় যে কোনো লোককেই বিচলিত করে থাকে। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা সাধারণ মানুষের এই সেন্টিমেন্টে আঘাত দিয়ে থাকে যাতে তারা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। এ কথাটা সত্য যে প্রত্যেকটি মানুষের কম বেশি ব্যক্তিসম্পদ রয়েছে। শোষিত নিঃস্ব বা ফকিরকেও একেবারে সর্বহারা বলা যায় না। কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের কিছু না কিছু ব্যক্তিসম্পদ-সম্পত্তি রয়েছে। এদেরকে বলা হয় 'লুমপেন প্রোলেতারিয়েত'। এদেরকে খাওয়া পরা আশ্রয় চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি যতোই দেয়া হোক না কেন, তারা তাদের ঐ সামান্যতম সম্পদ-সম্পত্তির লোভ-লালসা পরিত্যাগ করতে কিছুতেই রাজী নয়, সম্পদ সম্পত্তি তাদের মনকেও আকৃষ্ট করে থাকে যদিও ঐ সামান্যতম সম্পদ সম্পত্তিতে তাদের কোনোই মৌলিক প্রয়োজন মিটছে না।

সুতরাং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বলতে গেলে একেবারেই অজ্ঞ অথচ এ কথা সত্য যে সমাজতন্ত্রের মধ্যেই কিন্তু তাদের সার্বিক মুক্তি ও ভাগ্যোন্নয়ন নিহিত। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ ও আপাতঃ শঙ্কিত হলেও সমাজতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থাই তাদের কাম্য। সমাজতন্ত্র মানে ব্যক্তিসম্পদ হারানোর ঝুঁকি, এই যে তাদের আপাতঃ চিন্তাধারা বা শঙ্কা, এর জন্যে দায়ী সমাজতন্ত্রের তথাকথিত সোল-এজেন্টরাই। এ কথা শুনতে অনেকেই অভ্যস্থ নন। অথচ এটাই বাস্তবসত্য। কারণ তারা জনগণকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়েছে যে, সমাজতন্ত্র মানে ব্যক্তিসম্পদ ব্যক্তিমালিকানার একেবারে বিলোপ নয়; শোষণের প্রক্রিয়া বা উপায়গুলোকে সমূলে উৎপাটন সাধন করা মাত্র। তারা জনগণকে বুঝাতে পারেননি যে, উৎপাদনের যাবতীয় উপায়গুলো বা জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক হচ্ছে সমাজের মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তি, উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানায় নিয়ন্ত্রণ হয় বলেই উৎপাদকশ্রেণী; মেহনতী মানুষ তাদের প্রকৃত পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তারা মালিকের দ্বারা শোষিত-প্রতারিত হচ্ছে। এই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান শোষকদের রাজনৈতিকভাবে উচ্ছেদ সাধন করে, তাদের সীমাহীন সম্পদ বা শোষণের যাবতীয় উপায়গুলোকে ব্যক্তিমালিকানা থেকে রাষ্ট্রীয় বা জনগণের সমষ্টিগত মালিকানায় আনায়নই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। এর অর্থ এই নয় যে সকলের সবকিছু জাতীয়করণ করা হয়। প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও সম্পত্তির ওপর অবশ্যই প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ যতোই বিকশিত হবে, অগ্রসর হবে, সমৃদ্ধ হবে, ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তির পরিমাণ, ভোগের পরিমাণ ততোই বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ প্রতিটি লোকের সুখ-সুবিধা ভোগের জন্যে তার ব্যক্তিসম্পত্তি ক্রমাগতভাবে বর্ধিত করাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক আর্থ ব্যবস্থায় সমাজের কর্মক্ষম প্রতিটি মানুষ তার যোগ্যতা সামর্থ্য

ও প্রতিভানুযায়ী বা সমাজের চাহিদার প্রয়োজনানুযায়ী সম্পদ উৎপাদন করবে এবং প্রতিটি মানুষ তার প্রয়োজনানুযায়ী আনুপাতিকহারে তা ভোগ করার অধিকার পাবে। সুতরাং মুনাফা সৃষ্টির অবকাশ এখানে নেই। সমাজের প্রয়োজনানুযায়ী সম্পদ সৃষ্টি হবে, মুনাফা অর্জনের জন্যে নয়।

এ ব্যতীত প্রতিটি মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা তথা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার গণ্ডিতে যাবতীয় রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রে যাওয়ার জন্যে যাবতীয় নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় সরাসরি অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম পালন ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা তথা অন্যান্য মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকা ও অবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এখানে বহুদলীয় বা বহু পথমতের রাজনীতির টানাটানি হানাহানি, ডানপন্থী বা পুঁজিবাদীদের ডিগবাজী ও ছল প্রতারণা এবং বামপন্থী বা সমাজতন্ত্রীদের হঠকারীতা ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং উগ্রসাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ধর্মতান্ত্রিক উদ্ভট রাজনীতির হোলিখেলার কারণে এদেশের বুকে কোনো স্থিতিশীল সুষ্ঠ আদর্শবাদী বা প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে পারেনি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটিই মাত্র গণভিত্তিক রাজনৈতিক দল, সেটি আওয়ামী লীগ। ব্যাপক গণমুখি হয়েও দলটি নির্ভরশীল ছিলো সম্পূর্ণভাবে বঙ্গবন্ধুর একক ব্যক্তিত্ব ইমেজ ও নেতৃত্বের ওপর। বিভিন্ন শ্রেণী বা বিভিন্ন পথমতের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই সংগঠনটি। এই সংগঠনের অভ্যন্তরে যেমন রয়েছে উঠতি ধনিক শোষক-সুবিধাবাদী প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠী, তেমনি রয়েছে সমাজতন্ত্রী-শোষিত-সর্বহারা বিপ্লবী শ্রেণী। ফলে দলের মধ্যে রয়েছে কোন্দল দ্বন্দ্ব সংঘাত। এটা মূলতঃ শ্রেণী-দ্বন্দ্ব, দলের নেতৃত্ব দখলের কোন্দল ও দ্বন্দ্ব।

স্বাধীনতা পূর্বকালীন বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্বের কোন্দলে পড়ে ও ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্যে অনেকেই আওয়ামী লীগ থেকে সরে গেছেন বা ঝরে গেছেন। তেমনি স্বাধীনতাত্তর কালেও এই সংগঠনের অনেক উপনেতা, পাঁতিনেতা ও কর্মীরা রাজনৈতিক আর্থসামাজিক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানান কোন্দলে পড়েন বা দলত্যাগ করেন। এমনটি হওয়ার কারণ কি?

আওয়ামী লীগ একটি ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী সংগঠন, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা এ সংগঠনের অন্যতম মূল লক্ষ্য হলেও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত ক্যাডার বা কর্মীবাহিনী ছিলো না। কৃষক শ্রমিক ফ্রন্টে এ সংগঠনের শক্তিশালী বেইস ছিলো না বা নেই। দলটি গড়ে উঠেছিলো পাকিস্তানী মুসলিমলীগ ও সামরিকবাহিনীর গণবিরোধী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও তাদের আশ্রিত স্বশ্রেণীভুক্ত

একচেটিয়া পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদী শোষকগোষ্ঠীর বল্গাহীন শোষণ এবং বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ থেকে এদেশের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে। এ সংগঠনের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা ও সংগ্রামী ভূমিকা এবং এদেশের শোষিত-অত্যাচারিত মানুষের মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকা পালনের কারণে সর্বস্তরের জনগণ আওয়ামী লীগের পতাকাতলে জড়ো হয়েছিলো। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর প্রদৃপ্তপ্রখর ব্যক্তিত্ব, সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা, তাঁর সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিপ্লবী কর্মোদ্দীপনা, আপোষহীনসংগ্রাম, লোভলালসাহীনতা এবং বাঙ্গালী জাতির প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ, ভালোবাসা, গভীর দেশপ্রেম ও তাঁর মন্ত্রমুগ্ধ জলদগম্ভির বক্তৃতা, বিশাল উদার মনপ্রাণ ইত্যাদি বাঙ্গালী জাতিকে আলোড়িত আন্দোলিত ও চেতনাদৃপ্ত-উজ্জীবিত করে তোলে। জনগণের মনে বাঙ্গালী জাতীয়তা-স্বকীয়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের অগ্নিসংকল্প ক্রমান্বয়ে স্ফূরিত হতে থাকে। এ সব কারণে এ দেশের চিরশোষিত বঞ্চিত মানুষ বঙ্গবন্ধুর মাঝে তাদের জীবনের আশা আকাংখার স্বপ্ন খুঁজে পায়; তারা বিপুলভাবে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হয়ে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে জড়ো হয়ে পড়ে।

অপরদিকে এদেশের উঠতি ধনিকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া ধনিক পুঁজিপতি শিল্পপতি তথা কায়েমী স্বার্থবাদী শোষকগোষ্ঠীর সাথে আর্থবৈষয়িক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তাদের একটি বিরাট অংশ ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্নে বিভোর হয়ে আওয়ামী লীগের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনি করে সর্বস্তরের মানুষ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। জনগণের ঐক্যকে পাথেয় করে বঙ্গবন্ধু অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিলো, বাঙ্গালী জাতিকে তথা বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের কবল থেকে প্রথমে স্বাধীন করে, মুক্ত বাংলার মাটিতে অর্থনৈতিক মুক্তি তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাই তো আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতার্জনের সাথে সাথেই তিনি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিশেবে শোষণের প্রধানতঃ হাতিয়ার বৃহৎ ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং যাবতীয় উপায়গুলোকে জাতীয়করণ করে জনগণের সমষ্টিগত মালিকানায় ন্যস্ত করলেন।

বাংলার বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ দীনদুখী মেহনতী শোষিত বঞ্চিত অবহেলিত মানুষের আশা-আকাংখা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে, নিজের লালিত ও উদ্ভাবিত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক প্রশাসনিক কর্মসূচীর আলোকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এবং পরিশেষে সেই সব কর্মসূচীসমূহকে বাস্তবায়িত করার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিলেন 'বাংলাদেশ-কৃষক-

শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' বা বাকশালের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগ যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণী পথ ও মতের রাজনৈতিক মানসিকতার সমন্বিত সংগঠন তথা মোটামুটি পেটি বুর্জোয়াগোষ্ঠীর নেতৃত্বের সংগঠন সেহেতু এ সংগঠন দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিলো না।

বঙ্গবন্ধু জানতেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে হঠানোর জন্যে একা ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। তাই তিনি মুসলিম লীগ করেছেন এবং পাকিস্তানের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ শাসক শোষকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী শাসন-শোষণের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করে তিনি বুঝলেন যে, বাংলার মানুষের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পরিহার করে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত করেন।

আওয়ামী লীগের মাধ্যমে স্বাধিকার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করার পর তিনি বুঝলেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশে শোষণহীন, প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা আওয়ামী লীগ দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ এ জাতীয় বহু শ্রেণীভিত্তিক এবং পথ ও মতের রাজনৈতিক সংগঠন দিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোনকালে কোন দেশে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রকে কল্পনাও করা যায়নি। এ ক্ষেত্রে এসে অনুপ্রাণিত হলেন খেলাফতে রাশেদীন, মার্কসবাদ ও লেনিনের কর্মযজ্ঞ থেকে। এ ব্যতীত বাংলার ঐতিহাসিক সাম্যবাদী সমাজ ও সাম্যবাদী বিপ্লবীদের কর্মোদ্দীপনা থেকেও অনুপ্রাণিত হলেন।

সৃষ্টি করলেন জাতীয় রাজনৈতিক প্লাটফরমঃ 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল।

সুতরাং বাকশাল হলো, শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার একটি বৈপ্লবিক জাতীয় প্লাটফরম—সমাজের সর্বশ্রেণী সর্বস্তর ও সর্বদলীয় সর্ব পেশাভিত্তিক জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল জাতীয় সংগঠন। এখানে ব্যক্তি গোষ্ঠী বা শ্রেণীস্বার্থ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের কোনো অবকাশ নেই। বাংলার দীন-দুঃখী-শোষিত-বঞ্চিত-অবহেলিত শ্রমজীবি মেহনতী মানুষ তথা বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ও তাদের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক সংগঠন এই ' বাংলাদেশ-কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল।

বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারায়
ক. ধনিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি
খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি

ক. ধনিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি

সমাজে কারা ধনিক তাদের চিনতে ও বুঝতে আমাদের মোটেই বেগ পেতে হয় না। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি মুহূর্তে-প্রতিক্ষণে ধনিকদের সাথে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ-মেলামেশা হচ্ছে। এ ব্যতীত এরা কে ও কি এবং কিভাবে সমাজে তাদের আগমন ঘটেছে ও ঘটছে তদ্বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বৃহৎ বা একচেটিয়া উৎপাদন ক্ষেত্র ও উপায়গুলোর মালিকদেরই এক কথায় ধনিকশ্রেণী বলা যেতে পারে। এই ধনিকশ্রেণী উৎপাদন কার্যে কোনো শ্রম প্রদান করে নাত্ম এরা হলো মেহনতী শ্রমিকদের শ্রমের ফসলের সিংহস্বত্ত্বভোগী বা পরজীবি। এই স্বত্ত্ব তারা পেয়ে থাকে ব্যক্তিমালিকানার জোরে। তারা শারীরিকভাবে শ্রম বিনিয়োগ করে না সত্য, তবে তাদের উৎপাদনের উপায়গুলো যেমন শিল্প কলকারখানা, জায়গা-জমি ও অন্যান্য পুঁজি বা জিনিসপত্র উৎপাদনকার্যে শ্রমিকদের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায়গুলো হলো মালিকদের মূলধন বা পুঁজি। তবে পুঁজি কথাটা সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োজিত নগদ অর্থের ক্ষেত্রে আজকাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মোট কথা একচেটিয়া বৃহদায়তন উৎপাদনের যাবতীয় উপায়গুলোর মালিকদেরকে ধনিকশ্রেণী বলা হয়ে থাকে এবং মূলত এদেরেকেই বলা হয় শোষকগোষ্ঠী। কারণ শ্রমিকদের শ্রম শোষণ করেই এদের যাবতীয় আর্থবৈষয়িক ক্ষেত্রের শ্রী বৃদ্ধি ঘটে থাকে এবং এ প্রক্রিয়ায়ই তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মানব সমাজে কী প্রক্রিয়ায় এ ধনিক শোষকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে বা ঘটে থাকে সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে ধনতান্ত্রিক শোষণ কী এবং এর অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি কী এবং কীভাবে তা সমাজের বুকে প্রবাহিত হয় তদ্বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা জেনেছি যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিসত্ত্বা, ব্যক্তিচিন্তা, ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিসম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। ফলে ব্যক্তিমালিকানা বা অর্থসম্পদের স্বত্ত্বের প্রশ্নই ছিল না। ব্যক্তিমালিকানাই হলো শোষণ-দুর্নীতি-

অবিচারের মূল উৎস।

আদিম সাম্যবাদী সমাজের কথা ছেড়ে দিলে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো প্রকার সমাজ ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটেছে (একমাত্র বর্তমানকালে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বা দেশ ব্যতীত) তার মূলেই রয়েছে শোষণ-দুর্নীতি-প্রতারণা-শঠতা-অবিচার-অত্যাচার নির্যাতন। দাসপ্রথার যুগে শোষণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছিলো। ক্রীতদাসরা পরিশ্রম করে যা কিছু সম্পদ সামগ্রী উৎপাদন করতো তার একচেটিয়া মালিক ছিল প্রভু বা মালিকগণ। এর পরেই এসেছে সামন্ততান্ত্রিক ভূমিপ্রথার যুগ। এযুগে ভূমিদাস শ্রমিকরা ছিল উৎপাদকশ্রেণী; উৎপাদিত সম্পদ ভোগ করতো সামন্তপ্রভু বা মালিকশ্রেণী। প্রচলিত ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী সমাজে যে শোষণ ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাকে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা বলা হয়। তবে ধনতান্ত্রিক শোষণের প্রক্রিয়া এমনই উন্নততর যে সহজেই এ শোষণের রূপ সাধারণ মানুষ ধরতে পারে না। দৃশ্যত অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যে, এ ব্যবস্থা একটি নৈতিকতা বা ন্যায়ের মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মূলত এটা সত্য নয়।

সুতরাং কাল সময় যুগ ও সমাজ পরিবর্তনের সাথে উৎপাদন প্রণালী ব্যবস্থা ও ক্ষেত্রগুলোর ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিকাশের সাথে শোষণ ব্যবস্থার রূপ-গতিপ্রকৃতিও বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। এখন আমাদের জানতে হবে যে, ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী ও আধাসামন্তবাদী শোষণের উৎস গতিপ্রকৃতি কী এবং সমাজে কিভাবে তা চলছে।

মুনাফা বা লাভই হলো পুঁজিবাদী-ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল কথা। তাছাড়া এ দুটি শব্দ আমরা প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে থাকি। মুনাফা হলো প্রকৃত পক্ষে ধনিক সমাজের শোষণের ফল। মুনাফার অর্থ হলো এই যে, মালিক (ধনিক বা পুঁজিপতি) তার শিল্প কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জায়গা জমি প্রভৃতি উৎপাদন ক্ষেত্রে যে মূলধন-পুঁজি বিনিয়োগ যতোটা করে তারচে' সে অধিক আদায় করে। বিনিয়োগকৃত মূলধন-পুঁজি উঠে এসে বাকী যা উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত থাকে সেটাই হলো মুনাফা বা লাভ।

পুঁজিপতি-মূলধনের মালিক উৎপাদনকার্যে শারীরিক বা কায়িক কোনো শ্রম প্রদান করে না। তার জায়গা-জমি-মেশিনপত্র, কাঁচামালসহ উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ বা শক্তিসমূহ বা পুঁজি বা মূলধন উৎপাদনকার্যে বিনিয়োজিত হয়। উৎপাদন শক্তিগুলো কাজে লাগাবার জন্যে তাকে শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। শ্রমিকের শ্রমোৎপাদিত ফসল বা সম্পদ যখন তার মালিক অন্য কোনো উৎপাদন ও আর্থিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে তখন তাকে বলা হয় ব্যক্তিপুঁজি।

বর্তমান ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী যুগ, ব্যক্তিপুঁজির যুগ। ব্যক্তিপুঁজির বদৌলতে সৃষ্টি হয়েছে একচেটিয়া পুঁজি ও মুনাফার যুগ। একচেটিয়া ব্যক্তিপুঁজির মালিক বা

পুঁজিপতিরা পণ্য উৎপাদনকার্যে শুধু শ্রমিকদেরই শোষণ করছে না, সাথে সাথে ক্রেতা সাধারণের নিকটে তাদের পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে অতিরিক্ত বা বর্ধিত মুনাফা আদায়ের লক্ষ্যে বাজারে (একচেটিয়া পণ্যবাজার) কৃত্রিম সংকট, অধিক সরবরাহ করা, সাময়িকভাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিয়ে দেয়া, কারখানায় লে-অফ ঘোষণা ইত্যাদি কারসাজি করে থাকে। এভাবেই ক্রেতা-জনসাধারণকে পুঁজিপতি বা ধনিকগোষ্ঠী বা মালিকগোষ্ঠী শোষণ করছে।

উৎপাদন শক্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ অর্জনের জন্যে যে শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয় সেই শ্রমিকরা তাদের শ্রমের পুরো, প্রকৃত মূল্য বা পারিশ্রমিক পায় না। তারা যা পেয়ে থাকে তাহলো তারা যে শ্রমদ্বারা সম্পদ উৎপাদন করে, সেই অনুপাতে পারিশ্রমিকের পরিমাণ অতি নগণ্য। বাকি শ্রমের মুনাফার সবটুকুই চলে যায় মালিক বা পুঁজিপতির হাতে। পুঁজিপতিরা পুঁজি বা উৎপাদনশক্তিগুলোর মালিক। এগুলো ব্যতীত শ্রমিকরা তাদের জীবিকার্জন করতে অক্ষম। ফলে শ্রমিকরাও হয়ে পড়ে পুঁজিপতিদের দেয় দরের দাস। শ্রমিকদের শ্রমবিক্রয়ের ফলে কতো পরিমাণ মুনাফা বা লাভ হয়ে থাকে তার সাথে শ্রমিকদের কোনোই সম্পর্ক নেই। কারণ পূর্বেই পুঁজিমালিক শ্রমশক্তি ক্রয় করে থাকে। এ পর্যায়ে পুঁজিমালিকই শ্রমশক্তির মালিক।

পুঁজিবাদী-ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমশক্তি একটি বিশেষ পণ্য হিশেবেই পরিগণিত হয়ে থাকে। শ্রমিকরাই তাদের শ্রমশক্তিকে পণ্য হিশেবে পুঁজিপতির কাছে বিক্রয় করে একটা নির্ধারিত মজুরী বা পারিশ্রমিক পায়। শ্রমিকের শ্রমশক্তির গুণগত দিক এই যে, এ পণ্যটি সে তার নিজের মূল্য অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি মূল্য সৃষ্টি করে থাকে। শ্রমিকরা এই যে মূল্য সৃষ্টি করলো তার সামান্য একটা অংশমাত্র সে পায়, বাকি বৃহত্তম অংশটি চলে যায় পুঁজিমালিকের হাতে মুনাফা হিশেবে। এটাই হলো শ্রমশোষণ। এ শোষণকে শ্রমিকদের নীরবে সহ্য করতে হয়। কারণ তাদের সংখ্যানুপাতে পুঁজিমালিকের উৎপাদনশক্তির আয়তন বা ক্ষেত্র অনেক কম। ফলে বেকারত্বের ভয়ে, সংসারের স্বার্থেই তাদেরকে মালিকের অন্যায় অবিচার জুলম অত্যাচার বঞ্চনা শোষণ ও রক্তচক্ষুকে নীরবে সইতে হয়।

সুতরাং পরিশ্রম না করেই যে লোক যে অর্থসম্পদ আয় করে তার সমস্তই এ প্রক্রিয়ায় অপরকে—অর্থাৎ মেহনতী শ্রমিককে, অসহায়কে শোষণ করার ফলশ্রুতিতে আসে। প্রথম দৃষ্টিতে পুঁজিমালিকের ন্যায়তঃ পাওনা বলে 'মুনাফা' নামক যে জিনিসটা মনে হয়, আসলেই তা আসে শ্রমিক শোষণের মধ্য দিয়ে। তবে কখনো কখনো শ্রমিকের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বোনাস-ভাতা তাদেরকে দেয়া হয়। এর অর্থ এই নয় যে, পুঁজি-মালিক তার মুনাফা থেকে এসব দিচ্ছে—মুনাফা কম নিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রমের মূল্য কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে

একদিকে শ্রমিকদের যেমন আরো উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে পরিশ্রম প্রদান করতে উৎসাহিত করছে, শ্রমিক আন্দোলনকে নিরুৎসাহিত করছে, শ্রমবিপ্লব ও সাম্যবাদী সামাজিক বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখছে, পাশাপাশি মালিকগণ তাদের পণ্যসামগ্রীর মূল্যও বাজারে চড়া করে দিচ্ছে। সুতরাং শ্রমের মজুরী যা-ই বাড়ানো হোক না কেন, তা সুদে আসলে বর্ধিতহারে উঠিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ পুঁজিমালিকরা তাদের অসীম মুনাফা অর্জনের জন্যে শোষণকার্য অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে নানান কলা-কৌশল, ফন্দিফিকির, কারসাজি ও সাধু-অসাধু পন্থায়। এ জন্যেই মনীষী কার্ল মার্কস শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের মজুরী নিয়মকে বা প্রথাকে 'মজুরীদাসত্ব' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মার্কসীয় দর্শনে 'মজুরী প্রথা' বলতে কিছুই নেই। আর নেই ব্যক্তিপুঁজি বা ব্যক্তিমালিকানার অবকাশ। কিন্তু এই প্রচলিত সমাজের মজুরী দাসত্বের নিয়মনীতি ঘুচঁবে কী করে, কী করে শ্রমশক্তি অপহরণ, শোষণ তথা শ্রমজীবি মেহনতী মানুষের ওপর শোষণ বঞ্চনা বন্ধ হবে ? পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, মালিকশ্রেণী তাদের মালিকানা বা তাদের নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন উপায়গুলো, মূলধন বা পুঁজি পরিচালনা-বিনিয়োগ বা সম্পদ উৎপাদন কার্যে যে মজুরী দিয়ে শ্রমিকদের শ্রমশক্তি ক্রয় করে থাকে সেই উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকানাস্বত্ব বিলোপ সাধন না করা পর্যন্ত 'মজুরী দাসত্ব' প্রথা ও যাবতীয় শোষণ দুর্নীতিকে দূরীভূত করা যাবে না—যাবেই না।

প্রকৃত সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, যেদিন পুঁজি ও উৎপাদন শক্তিগুলো উৎপাদকশ্রেণী তথা মেহনতী শ্রমজীবি মানুষের সমষ্টিগত মালিকানায় আসবে সেদিন থেকে আর মজুরী দাসত্ব বা শোষণ থাকবে না। শ্রমজীবিরা যা কিছু সৃষ্টি করবে, যা কিছু উৎপাদন করবে—সে সবের মালিকও হবে তারা সমষ্টিগতভাবে। সুতরাং, ব্যক্তিপুঁজি বা শোষণ সৃষ্টির হাতিয়ার ব্যক্তিমালাকানাস্বত্ব উচ্ছেদ করে সেগুলোকে সমষ্টিগত সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করা হলেই কেবলমাত্র শ্রমজীবিদের মূল্য, তাদের নিরাপত্তা, শান্তি, কল্যাণ, স্বাধীনতা, ভাগ্যোন্নয়ন ও শোষণমুক্তি নিশ্চিত হতে পারে, সমাজ দেহ থেকে দুর্নীতির কালোছায়া মুছে যেতে পারে বলে বঙ্গবন্ধু দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। দেশের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিপেশার সাথে জড়িত। স্বভাবতঃই এদেশে কৃষিশোষণ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই কৃষিশোষণ আমাদের চোখে তাই সহজেই ধরা পড়ে। শোষণের অন্যান্য উপায় যেমন শিল্প-কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঠিকাদারী, ধর্ম ব্যবসা ইত্যাদির শোষণকার্য অতি ভদ্র ও সুকৌশলে হয় বলে তা সাধারণের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। কিন্তু কৃষি শোষণের শিকার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ। ক্ষুদে কৃষক, মাঝারি কৃষক

বর্গাদার ভূমিহীন কৃষক মজদুর, এরাই এ শোষণের প্রত্যক্ষ শিকার, বিশেষ করে বর্গাদার ভূমিহীন কৃষক-মজদুররাই এ শোষণের নির্মম শিকার। কৃষি শোষণ বা আধাসামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার শোষণের দাপট কতো প্রখর তা ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

বাংলাদেশে বর্তমান ভূমিহীনদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। শতকরা ১৫ ভাগ কৃষকের মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষিজমি রয়েছে, আর বাকি শতকরা ৫ ভাগ হলো বৃহৎ ভূমিমালিক, ভূস্বামী ও জোতদার এবং শতকরা ১৫% ভাগ লোক কৃষি ব্যতীত অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। ক্ষুদে কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকদের একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বৃহৎ ভূমিমালিক জোতদার বা অনুপস্থিত মালিকদের (যারা অন্যান্য পেশার সাথেও জড়িত) জমি বর্গায় চাষাবাদ করে থাকে। বাকি ক্ষুদে ও ভূমিহীন কৃষক মজুর হিশেবে মাঝারি ও বৃহৎ ভূমিমালিকদের জমিতে নিয়োজিত রয়েছে।

বর্গাদার কৃষক জমির ফসল উৎপাদনের যাবতীয় ব্যয় দায়-দায়িত্ব যেমন চাষ, বীজ, সেচ, সার, ওষুধ ও নিড়ানোসহ যাবতীয় খরচ-খরচার দায়-দায়িত্ব বহন করে থাকে। যেভাবে জমিতে উৎপাদন ভালো হয় তার ব্যবস্থা ঐ বর্গাদারকেই করতে হয়, কারণ জমিতে উৎপাদন ভাল না হলে ভূমিমালিক পরবর্তী মওসুমে বর্গাদারকে পরিবর্তন করে ফেলতে বাধ্য। এই ভয়ে বর্গাদার কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যত্নসহকারে জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন করতে সচেষ্ট থাকে। জমিতে উৎপাদিত ফসল বন্টনের ক্ষেত্রে কোথাও আধা-আধি, কোথাও $\frac{১}{৩}$ ভাগ ফসল বর্গাদাররা পেয়ে থাকে। এই বন্টননীতিতে দেখা যায় যে, বর্গাদার কৃষক যে পরিমাণ শ্রম ও অন্যান্য উপকরণ ব্যয়বার বহন করেছে, তার তুলনায় প্রাপ্ত অংশের পরিমাণ অনেক কম। এর কারণও অবশ্য আছে। বর্গাদার কৃষক যেহেতু একেবারেই দরিদ্র, ফসল উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ, কলাকৌশল, সময় মতো বা অর্থের অভাবে ভালো বীজ, সার, সেচ, ওষুধ, নিড়োন ইত্যাদি যথাযথ হয় না, ফলে জমিতে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। এ ব্যতীত খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণে উৎপাদন না হলে তার বিনিয়োগকৃত শ্রম ও অন্যান্য ব্যয়িত উপকরণসমূহের মূল্য সে পায় না। অবশ্য এতে মালিকের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। কারণ যা সে পায়, তা-ই তার লাভ। কারণ একমাত্র ভূমি ব্যতীত তার আর কোনো উপকরণ এখানে খাটে না। যা উৎপাদন হচ্ছে, তার আধা-আধি বা সিংহভাগই সে পাচ্ছে। এ ব্যতীত ভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর মালিক নির্ভরশীল নয়। শহর-বন্দর-গঞ্জ বাজারে রয়েছে ভূমিমালিকদের (বৃহৎ মালিক) শিল্পকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, মহাজনী ও অন্যান্য লাভজনক প্রতিষ্ঠান।

এভাবেই বর্গাদার কৃষকরা হচ্ছে তাদের বিনিয়োগকৃত শ্রম ও অন্যান্য উপকরণসমূহের মূল্য থেকে বঞ্চিত। এটাও এক প্রকার শোষণ। আর এ শোষণের হাতিয়ার হচ্ছে বৃহৎ মালিক-জোতদারদের ব্যক্তি মালিকানাধীন কৃষিজমি। এই কৃষিশোষণের ব্যবস্থার অপর নাম হচ্ছে আধাসামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থা।

ভূমিহীন কৃষক-মজদুররা শ্রমিক হিশেবে, দিনমজুর হিশেবে অর্থাৎ মজুরী দাসত্ব প্রথায় বা মজুরী প্রথায় তুলনামূলক বড়ো কৃষক, মাঝারি কৃষক, ক্ষুদে কৃষক, বর্গাদার কৃষকদের অধীনে এবং গ্রামীণ অন্যান্য ছোটো-বড়ো পেশায় তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে থাকে। শিল্পশ্রমিকদের জীবনে কিছুটা নিরাপত্তা থাকে, তারা ট্রেড ইউনিয়নের নীতিমালায় আন্দোলন করতে পারে—দাবী আদায় করতে পারে। কিন্তু ভূমিহীন কৃষক-শ্রমিক বা কৃষিশ্রমিকদের কোনো সংগঠন নেই; ট্রেড ইউনিয়ন সেখানে অচল, তাদের কোনো দাবী আইনতঃ গ্রহণীয়ও নয়; তারা কৃষিমালিকের ইচ্ছেকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ভূমিহীন কৃষকরা কেমন করে শোষিত বঞ্চিত হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়।

অপরদিকে মাঝারি ও ক্ষুদ্র জমির মালিক কৃষকরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ—সময় মতো টাকার অভাবে ভালো বীজ সার সেচ ওষুধ ও অন্যান্য উপকরণ বিনিয়োগ করতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। তারা নিজেরা এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিয়ে উৎপাদন কার্য চালায়। এ ব্যতীত খরা অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগের ফলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ফলে নিজেদের শ্রমশক্তি, শ্রমিকের শ্রমশক্তি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহন করে শেষ পর্য্যায়ে যে ফসল উৎপাদন হচ্ছে, ঐ সবের তুলনায় উৎপাদন অনেক কম হয়; ফলে বছরের খোরাকপোষ তাতে উঠে আসে না। ফলশ্রুতিতে মাঝারি ও ক্ষুদে কৃষকরা অভাবের তাড়নায় বৃহৎ জমিমালিক ও অন্যান্য পেশার ধনিক পুঁজিপতি মহাজন সুদখোরদের নিকট জমি বিক্রি বা বন্দক রাখতে বাধ্য হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় মাঝারি কৃষকরা ক্ষুদ্র কৃষকে এবং ক্ষুদে কৃষকরা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়ে পড়ে। এ ব্যতীত মাঝারি ও ক্ষুদে কৃষকদের জমি তাদের পরিবারের মধ্যে উত্তরাধিকারভিত্তিক ভাগ বটোয়ারা হওয়ার ফলেও ক্রমান্বয়ে তার ঐ একই কার্যকারণের ফলশ্রুতিতে ভূমিহীনদের কাতারে শামিল হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় মুষ্টিমেয় ধনিক-পরজীবি অকৃষক বৃহৎ ভূমিমালিক ও জোতদারদের হাতে দেশের আবাদযোগ্য কৃষিজমি গিয়ে জমা হচ্ছে এবং কৃষি পেশার সাথে সম্পর্কহীন বা অকৃষক মালিকদের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে কৃষিব্যবস্থা চলে যাওয়ার ফলে কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে সামন্তবাদ বা জমিদারী প্রথা নেই সত্য। কিন্তু ঐ প্রথার বিবর্তিত অবশেষরূপে জোতদারী ও আধাসামন্তবাদী বর্গাপ্রথার ভূমিব্যবস্থা

প্রচলিত আছে। এই আধাসামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার ফলে বাংলার প্রাণ বলে কথিত কৃষককূল শোষিত বঞ্চিত ও দুর্বিপাকগ্রস্ত হয়ে দিন দিন সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে। এবং যদি প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার গতিধারা ও পরিবেশ অব্যাহতভাবে চলতেই থাকে তাহলে আগামী ২০ বছর পর বাংলাদেশে নতুন করে জমিদারী বা সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থা এবং সেই সাথে সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়ে পড়বে বলে আমাদের মনে আশংকা জাগে।

সুতরাং বাংলাদেশের সামগ্রীক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার ওপর দৃষ্টিপাত করলে আমরা শোষণব্যবস্থার প্রধানতম তিনটি প্রবাহ দেখতে পাই। **এক:** শিল্প কলখানা, **দুই:** ব্যাংক বীমা ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং **তিন:** আধাসামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থা। উক্ত তিনটি ক্ষেত্রপ্রবাহ থেকে বেরিয়ে এসেছে মূলতঃ দুটি শ্রেণী, যথাঃ ধনিকশ্রেণী ও মেহনতী দরিদ্র শ্রেণী। আর পুঁজিপতি জোতদার শ্রেণী থেকে মূলতঃ অবিভূত হয়েছে বণিক বুর্জোয়া মুৎসুদ্দিশ্রেণী। এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক আমলা ঠিকাদার মহাজন দালাল ও অন্যান্য সুবিধাবাদী পরজীবিগোষ্ঠীর আর্বিভাব ঘটেছে ধনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার গর্ভ থেকে। এই হলো ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী শোষণভিত্তিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মোটামুটি একটা চিত্র।

এই শোষণভিত্তিক ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার কবল থেকে সাধারণ শ্রমজীবি কৃষক-শ্রমিক মজদুর জনতাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে স্বাধীনতাত্তোরকালে বঙ্গবন্ধু বৃহৎ ব্যক্তিমালিকানাধীন পরিত্যক্ত শিল্পকলকারখানা, বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাংক বীমা ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছিলেন এবং ভূমিব্যবস্থার ব্যক্তিমালিকানার ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা আরোপের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং এ ক্ষেত্রের পরবর্তী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। এবং সামগ্রীকভাবে দেশের আপামর গণমানুষের সুখ শান্তি কল্যাণ সমৃদ্ধি শোষণমুক্তি ও সমাজ থেকে সর্বপ্রকার দুর্নীতির মূলোৎপাটন সাধনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল কর্মসূচী প্রদান করে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সমূলে উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলেন।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দেশীয় পুজারীগোষ্ঠী তাদের মুরব্বী আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিহত করার হীনলক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং তাদের এজেন্টদেরই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে এবং অধ্যাবধি তারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে বসে আছে, তারা তাদের আর্থবৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি করে যাচ্ছে কৃষক-শ্রমিক মেহনতী জনতার ওপর অমানবিক শোষণকার্যের ষ্টিমরোলার চালিয়ে দিয়ে।

ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষকগোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বতঃসিদ্ধ রূপ প্রতিহিংসা জিঘাংসা ও রক্তপাতের হোলিখেলার মাধ্যমে এভাবে আরেকবার প্রকাশিত হলো। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপসমূহও বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত হলো; প্রতিষ্ঠিত হলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার বদৌলতে মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী পরজীবি শোষকগোষ্ঠী সীমাহীন অর্থসম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে এবং বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক শ্রমিকসহ সর্বস্তরের মেহনতী মানুষ চরম ক্ষুধা দারিদ্র্যতা অভাবের নির্মম তিমিরে হাবুডুবু খাচ্ছে, তারা সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে, জীবনের সবকিছু থেকে বিতাড়িত হয়ে ধুকে ধুকে মরছে। এটাই হলো ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি ও লক্ষ্য।

খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি

॥ এক ॥

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজের যাবতীয় উৎপাদনোপকরণের ওপর সমাজের সমষ্টিগত মানুষের সমষ্টিগত মালিকানা তথা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলা হয়। অর্থাৎ শোষণের হাতিয়ার 'ব্যক্তিমালিকানা'কে উচ্ছেদের মধ্য দিয়েই সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই শোষণহীন সমাজের অপর নামই হলো সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী সমাজ। এ জন্যে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শোষণভিত্তিক ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয় না। সমাজের সমষ্টিগত মানুষের মালিকানায় উৎপাদন উপকরণসমূহের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ার ফলে এ সমাজে কেউ কাউকে শোষণ প্রবঞ্চনা করার অবকাশ পায় না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-রাষ্ট্রে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা সমাজের ব্যাপক মানুষের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

এখানে একটি কথা আবারও প্রসঙ্গক্রমে পুনরুল্লেখ করতে হয়। কারণ সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অনেকেরই ভুল ধারণা পরিলক্ষিত হয়। তারা মনে করেন যে, সমাজতন্ত্র মানেই প্রত্যেক মানুষের সকল ধনসম্পদের জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রীয়করণ বুঝায়। এ কথা সঠিক নয়। শুধুমাত্র উৎপাদনের উপায়সমূহ—যা থেকে মানুষের প্রতি মানুষের শোষণকার্য চলে, সেই উপায়সমূহকে জাতীয়করণ বা সমাজীকরণ বা রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় এ কথার অর্থ এই নয় যে, কারো কোন নিজস্ব সম্পত্তি (Personal Property) থাকবে না। নিজের প্রয়োজনের বা ব্যবহারের ওপর প্রত্যেকেরই নিজস্ব অধিকার রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ যতোই অগ্রসর হবে, সমাজের সার্বিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি ভোগের পরিমাণ ততোই বেড়ে যাবে। প্রত্যেকেরই সুখ-সুবিধা ভোগের লক্ষ্যে প্রত্যেকের নিজস্ব সম্পত্তি ভোগের আনুপাতিক হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। এটাই হলো সমাজতান্ত্রিক

অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। এ সমাজে প্রত্যেকেই সমাজের প্রয়োজনানুয়ায়ী সম্পদ উৎপাদন করবে এবং প্রত্যেকেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে যোগ্যতানুযায়ী অংশগ্রহণের অনুপাতে সম্পদ সামগ্রী ভোগ করবে। ফলে এখানে মুনাফা সৃষ্টির কোনো অবকাশ নেই।

ধনতান্ত্রিক সমাজের পরবর্তী সমাজই হলো সমাজতান্ত্রিক সমাজ। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলো শোষণের চরম রূপ। আর এ শোষণের শিকার সমাজের শতকরা ৯৫ ভাগ শ্রমজীবী মেহনতী মানুষ। সাথে সাথে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তথা শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা শুরু হয়েছে। এ সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি হিশেবে ধনতান্ত্রিক শোষকসমাজের পতন ঘটবে; তদস্থলে এক নতুন আর্থসামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। সেই ব্যবস্থাই সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থা।

আধুনিক সাম্যবাদের প্রবক্তা, সমাজ বিজ্ঞানী মণীষী কার্লমার্কসের মতে সাম্যবাদ তিনটি ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথাঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা।

ইতিহাসের সকল ঘটনাবলীই বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যে তথা সমাজের পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারায় মানবগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ সংঘাত অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংগ্রামের ফলশ্রুতি। মানবজাতির ইতিহাস হলো শোষক শোষিতের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস; শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। অর্থনৈতিক শোষণকে কেন্দ্র করেই এ সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটেছে। এক শ্রেণী চেয়েছে বা চায় শোষণ-পেষণ-অত্যাচার নির্যাতন-প্রতারণা-শঠতা ও অন্যান্য কূটকলাকৌশলের মাধ্যমে সীমাহীন অর্থ সম্পদ ও প্রভাবপ্রতিপত্তি অর্জন করতে, আর অপর শ্রেণী চেয়েছে বা চায় ঐ সব থেকে সার্বিক মুক্তি। ফলে সকল সময়ে সকল সমাজে সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ।

পৃথিবী ও মানবসভ্যতার ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের ওপর যে সমাজ ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটেছিলো ব্যক্তিসত্ত্বা ব্যক্তিচিন্তা ব্যক্তিস্বার্থ ব্যক্তিসম্পদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে সেই সমাজকে বলা হয়েছে দাসপ্রথার সমাজ। দাসপ্রথার বিবর্তিত পরবর্তী সমাজ ভূমিদাস প্রথা এবং ভূমিদাস প্রথার পরবর্তী সমাজ হলো সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। আর সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়েছে প্রচলিত ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজ এবং সর্বহারা শ্রেণী। সেই দাস প্রথার যুগ থেকে শুরু হয়েছে মানবজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত—সংগ্রাম আন্দোলন ও বিপ্লব; যা এখনো চলছে। তাই মানবজাতির সহজাত বৈশিষ্ট্যের ইতিহাস হলো সমাজের পরস্পরবিরোধী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস। অর্থনৈতিক ইতিহাস এই শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।

মার্কসের 'উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব' উৎপাদনকর্মে শ্রমসময় ও শ্রমিকের শ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উৎপাদনের স্বাভাবিক অবস্থায় শ্রমের গড় কর্ম দ্বারা একটি দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে যে-সময় লাগে, সেটাই শ্রম সময় এবং উৎপাদন কার্যে যে পরিমাণ "সামাজিকগত প্রয়োজনীয় শ্রমসময়' বা 'Socially necessary Labour-time'—ব্যয় হয় তা-ই দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। ঐ যে মূল্যের 'শ্রমতত্ত্ব', এর ওপরই 'উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব' প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল্যের শ্রমতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই 'উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব' প্রণীত হয়েছে। কারণ উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের পরিমান দিয়েই দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। সুতরাং উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের সবটুকুই শ্রমের প্রাপ্য। ধনতান্ত্রিক সমাজে এ ব্যবস্থা একেবারেই অচল। এ সমাজে শ্রমিক তাঁর শ্রমানুপাতে পারিশ্রমিক বা মূল্য পায় না; শ্রম অপেক্ষা অনেক কম পায়।

কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনে শ্রমিক যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় করে থাকে তদ্-অপেক্ষা যতোটুকু কম মূল্য পায় এবং শ্রমের মূল্য যা অবশিষ্ট বেশি বা অতিরিক্ত থাকে সেটাকেই 'উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব' বা 'Surplus Value' বলা হয়ে থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনিকশ্রেণী বা উৎপাদনোপকরণের মালিকরাই তাদের মালিকানাস্বত্বের জোরে শ্রমিকের শ্রমের এই উদ্বৃত্ত মূল্য একচেটিয়াভাবে ভোগ করে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে 'উদ্বৃত্ত মূল্য' বা মুনাফা বা লাভ বলতে কিছুই নেই। কারণ শ্রমিকরা যে-পরিমাণ শ্রমশক্তি উৎপাদনকার্যে বিনিয়োগ করবে, সেই শ্রমশক্তিদ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের সবটুকুই শ্রমের প্রাপ্য; শ্রমিকের প্রাপ্য। এ সমাজে উৎপাদনোপকরণগুলোর ওপর ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা স্বত্ত্বাধিকার নেই যে ব্যক্তি বা মালিক তার বিনিয়োগকৃত উৎপাদনোপকরণগুলোর প্রাপ্য দাবী করে। এ সমাজে এর মালিকানা শ্রমজীবী মানুষের সমষ্টিগত বা সামাজিক মালিকানায় ন্যস্ত থাকে। সুতরাং শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যে সবটুকুই শ্রমের প্রাপ্য। এটাই হলো সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি।

আর ঐতিহাসিক বিবর্তনের বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানবজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের গতিধারাকে আদিম সাম্যবাদ, দাস প্রথা, ভূমিদাস প্রথা বা সামন্তবাদ, ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ, এই কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

শ্রেণীহীন, স্তরহীন, শোষণহীন, ধর্মহীন, রাষ্ট্রহীন, ব্যক্তিমালিকানাহীন ইত্যাদি অবস্থায় আদিম সাম্যবাদী সমাজ গড়ে উঠেছিলো। এ সমাজে সবকিছুই ছিলো যৌথ বা সমষ্টিগত স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে উপজাতীয় সমাজের প্রধান, সমর প্রধান, উৎসব প্রধান, কৃষি প্রধান, বানিজ্যিক প্রধান ও অন্যান্য

প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মনে ব্যক্তিসত্ত্বা, ব্যক্তিচিন্তা, ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিসম্পদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বীজ অংকুরিত হতে থাকে ধনসম্পদের লোভ-লালসা ও ভোগদখলকে কেন্দ্র করে। এ প্রক্রিয়ায় মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হলো। এ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জীবনযাপনের বিভিন্ন পেশার উদ্ভব ঘটলো। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন প্রণালীর ক্রমবিকাশ ঘটতে লাগলো। ক্রমান্বয়ে শ্রমবিভাগও শুরু হলো, শোষণের কার্যক্রম শুরু হলো, সমাজে প্রভূ ও দাস অর্থাৎ পেট্রেসিয়ানস্ ও প্লেবিয়ানস সৃষ্টি হলো। সমাজে শ্রেণীসত্ত্বা সৃষ্টি এবং কালক্রমে সমাজ শোষক-শোষিত এই দু'শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়লো। অর্থাৎ অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের প্রভাবে বিবর্তনের যে উত্তাল জাগরণ সৃষ্টি হয়, তারই ফলশ্রুতিতে মানবসমাজে দাসপ্রথা, সামন্তবাদ, ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। অর্থনৈতিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর বা ধাপগুলোর মধ্যে ধনতন্ত্রের বিলুপ্তির মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এটাই শোষণজাত সমাজ বিবর্তনের শেষ অধ্যায়। কারণ শ্রেণীসংগ্রামই প্রতিটি অর্থনৈতিক বিবর্তনের ফলশ্রুতি এবং উৎপাদিকা শক্তির বিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমাজে এই পরিবর্তন সাধিত হয়।

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর ব্যক্তিমালিকানা থাকার ফলে মালিকরা বিনাশ্রমেই শ্রমিকের শ্রমের উদ্বৃত্ত্ব মূল্য আত্মসাৎ করে থাকে। ফলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে আর্থিক ব্যবধান বাড়তে থাকে ক্রমান্বয়ে। উৎপাদনের বেলায় বিভিন্ন পুঁজিমালিক পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়লে অপেক্ষাকৃত কমদক্ষ পুঁজিমালিকরা প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে ছিটকে পড়ে যায়। এই অদক্ষ পুঁজিমালিকরা অবশেষে শ্রমিক-মেহনতী জনতার দলে ভিড়ে যায়। এর ফলে সমাজে নিঃস্ব শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে, বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সুযোগে ধনিক-মালিকগোষ্ঠী শ্রমিকদের নামমাত্র পারিশ্রমিকে তাদের শ্রমশক্তি ক্রয় করে থাকে। শ্রমিকরাও এই নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হয় বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। এ অবস্থায় দেশের যাবতীয় সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের করতলগত হয়ে পড়ে এবং দেশের অগুন্তি দরিদ্র মেহনতী মানুষ চরম দারিদ্র্যতার ভেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয় এবং সর্বহারায় পরিণত হয়ে ধুকে ধুকে মরে।

অপরদিকে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতির ফলে এবং ব্যক্তিপুঁজিতে সৃষ্ট সমাজে পণ্যের যোগান বেড়ে যায়, কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র বলে পণ্যের চাহিদা বাড়ে না। এর ফলে মজুতপণ্যের পাহাড় জমে ওঠে, বাজারে মন্দাভাব দেখা দেয়, মালিকের উৎপাদনশক্তি অচল হয়ে পড়ে, সমাজে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায় এবং

এভাবে পুরো সমাজটাই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের তিমিরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং এভাবেই ধসে পড়ে ধনতান্ত্রিক সমাজের ভিত। এই অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী সামাজিক অনাচার ও অব্যবস্থার কবল থেকে মুক্তিলাভের লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হয়ে ধনিক বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে এক সর্বাত্তক বিপ্লবে নেমে পড়ে। শোষক এবং শোষিত-এই শ্রেণীসংগ্রামের ফলশ্রুতিতেই সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী ধনতান্ত্রিক সমাজের নিয়মনীতি আদর্শ সবকিছু তছনছ করে দেয়; তাদের একতাবদ্ধ বিপ্লবের ফলে ধনিক শোষক বুর্জোয়াগোষ্ঠীর উচ্ছেদ সাধিত হয় এবং বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী অতঃপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয়। এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি মহান রুশ বিপ্লবের ইতিহাস থেকে এবং এভাবেই শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই ব্যবস্থার মূল কথা হলোঃ প্রত্যেকে তার সাধ্য-সামর্থানুযায়ী শ্রম বিনিয়োগের সুযোগ পাবে এবং সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিক লাভ করবে।' এটাই সমাজতন্ত্রের কথা এবং সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদ। অর্থাৎ 'প্রত্যেকে তার সামর্থানুযায়ী কাজ করবে এবং প্রয়োজনানুযায়ী সে তার প্রাপ্য পাবে'—এটাই হলো আধুনিক সাম্যবাদী সমাজের মূল দর্শন।

॥ দুই ॥

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাবতীয় উৎপাদনের উপায়সমুহের ওপর রাষ্ট্রীয় বা জনগণের সমষ্টিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। তাই সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থা উন্নয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপরই ন্যস্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে দেশে অর্থনৈতিক গতিধারা পরিচালনা করার লক্ষ্যে, ধনতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার তথাকথিত স্বয়ংক্রিয় মূল্যবোধকে বিলোপ করে সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্যে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে তার ওপর দায়িত্ব অপর্ণ করে। উৎপাদনোপকরণসমুহের বিলিবন্টন ও দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন এই কমিশন পূর্বনির্ধারিত জাতীয় পরিকল্পনা মাফিক ঘটায়। তাই এখানে ব্যক্তি উদ্যোগের কোনো অবকাশ নেই। এই আর্থব্যবস্থায় সমাজে কোন দ্রব্যসামগ্রী কখন কিভাবে কোথায় এবং কি পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে সে-বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থায় মুনাফা বলতে কিছু নেই। শ্রমিকরা যা-ই উৎপাদন করবে তার সবটুকুই তারা ভোগ করবে, মধ্যস্বত্ব বলতেও কিছু নেই। কিন্তু ধনতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থায় মুনাফা সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎপাদনধারা পরিচালিত হয়ে থাকে, ধনিক-মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের উপার্জিত সম্পদ পরজীবি হিসেবে ভোগ করে

থাকে। এবং এ মুনাফা লাভ করে থাকে মালিকশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনধারা পরিচালিত হয়ে থাকে সমাজেরই প্রয়োজনে, ফলে এখানে ব্যক্তিগতভাবে কেউ মুনাফা অর্জন ও এককভাবে তা ভোগ করতে পারে না। তাই সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থায় উৎপাদনোপকরণসমূহকে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশে সমাজের ব্যাপক মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত করা হয়। এ ব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে মুনাফার হার কমে গেলেও সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়। যেমন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তা ঘাট, নর্দমা-পয়ঃপ্রণালী, বিশ্রামাগার, স্বাস্থ্যনিবাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন প্রকার সরাসরি মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে ও কল্যাণে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সার্বিক স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক সমাজের এই সকল ক্ষেত্রে প্রভূত মূলধন বা পুঁজি খাটাতে হয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন-বিলিবন্টন ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয় উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত হওয়ার কারণে। এ অবস্থায় সমাজে বাণিজ্যিকচক্রের আবির্ভাব ঘটে থাকে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উঠানামা ঘটে। এই উঠানামার ফলশ্রুতিতে সমাজে ব্যাপক আকারে কর্মহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সরকারের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় বলে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যহীনতা সৃষ্টি হতে পারে না। এর ফলে যেমন একদিকে বাণিজ্যিক চক্রের প্রভাব দূর হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকে এবং অপরদিকে সকল কর্মক্ষম মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়ে দেশ থেকে কর্মহীনতা দূরীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা প্রবহমান থাকে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্ত ও অবাধ প্রতিযোগিতামূলক কর্মকান্ডের নামে অপব্যয়মুলক উৎপাদন ও একচেটিয়া প্রভাব-কর্তৃত্বের কোনো সুযোগ নেই। এ ব্যতীত শ্রমিকগণ শিল্প-কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনমূলক ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। ফলে তাদের কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক ক্রমোন্নয়নের গতিধারা প্রবাহিত হয়।

বঙ্গবন্ধু বলেছেনঃ 'ব্যক্তিমালিকানাই শোষণের হাতিয়ার'। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহ কতিপয় লোকের ব্যক্তিমালিকানায় থাকায় তারা শ্রমিকদের শ্রমশক্তিকে শোষণ করে থাকে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপায়সমূহকে সমাজীকরণ করা হয়; ফলে মুনাফামূলক উৎপাদন বন্ধ হয়, সমাজে শোষক শোষিত থাকে না, কোনো শ্রেণী সৃষ্টি হতে পারে না। এটাই শোষণহীন

শ্রেণীহীন সমাজ—শান্তির সমাজ। পক্ষান্তরে ধনতান্ত্রিক সমাজ হলো শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার শঠতা প্রতারণা অবিচার ব্যভিচার অশান্তির সমাজ; বৈষম্য অবৈধ প্রভাব প্রতিপত্তি ও অসুদোপায়ে অর্জিত সীমাহীন ব্যক্তিসম্পদ ও ধোকাবাজীর সমাজ।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে যার যার প্রতিভা-প্রজ্ঞা-মণীষা তথা যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজের সংস্থান ঘটে, অপরদিকে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজে অর্থসম্পদ, আত্মীয়তা ও অন্যান্য অবৈধ প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে যোগ্যতাহীন ব্যক্তির কাজের সংস্থান হয়ে থাকে। এ সব কারণে নিরীহ ও যোগ্যতর ব্যক্তি তাদের অধিকার হারায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে আত্মীয়তা নির্ভর করে মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে, অপরদিকে ধনতান্ত্রিক সমাজে আত্মীয়তা-সহমর্মিতা নির্ণিত হয় অর্থসম্পদের মাপকাঠিতে। এ সমাজে যার যতো বেশি অর্থসম্পদ আছে তার মানসম্মান ততো বেশি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানসম্মান তারই বেশি যার প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা বেশি।

ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্প কলকারখানা নির্মাণ ও উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিপুঁজি বিনিয়োজিত হওয়ার ফলে পুঁজি মালিক তার আসল মুল্য ও মুনাফা অত্যাধিক উচ্চমূল্যে উঠিয়ে নিতে আগ্রহী। এ কারণেই মালিক শ্রমিকদের শোষণ করে থাকে এবং পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়িয়ে ক্রেতাসাধারণকেও শোষণ করে থাকে, তার বিনিয়োগকৃত পুঁজি বা মূলধনের স্বার্থে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে শিল্পায়নের জন্যে শেয়ারভিত্তিক যৌথ তহবিলে সংগৃহীত মূলধন বা পুঁজি বিনিয়োজিত হয়। বিনিয়োজিত পুঁজির মুনাফার প্রয়োজন এখানে নেই। কারণ যৌথভাবে সকলে মিলে যা উৎপাদন করবে তা ভোগ করার অধিকারও তাদের। ফলে শোষণের কোনো অবকাশ এখানে নেই।

সুতরাং যে সমাজে শোষণ-প্রতারণা নেই সেই সমাজই শান্তির সমাজ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এই সমাজেই কেবলমাত্র ব্যাপক জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা থাকে। এর ফলে সমাজের প্রতিটি মানুষ তার প্রতিভা ও যোগ্যতা বিকাশের জন্যে সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে— ধনতান্ত্রিক সমাজে নয়।

এটাই হলো বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারায় সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি ও লক্ষ্য। এবং এ লক্ষ্যেই তিনি 'দ্বিতীয় বিপ্লব' তথা বাকশাল কর্মসূচী প্রদান করেছেন।

১. গ্রামীন অর্থনীতির প্রেক্ষাপট
২. বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রামসমবায় প্রকল্প

১. গ্রামীণ অর্থনীতির প্রেক্ষাপট

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক চিন্তাধারার প্রধানতম দিক হলো গ্রামীন অর্থনীতিতে পূর্ণ স্বনির্ভরতা অর্জন ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন। এ লক্ষ্যে তিনি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন 'বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম-সমবায় প্রকল্পে'র ভিত্তিতে। এক্ষণে সঙ্গতকারণেই আমাদেরকে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পটভূমিকা সম্পর্কে কিছু ধারণা নিতে হবে, নইলে আমাদের অনেক কিছুই বুঁঝতে কষ্ট হবে।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের অর্থনীতি তাই মূলতঃ কৃষিনির্ভর। আর গ্রামবাংলাই হলো কৃষি অর্থনীতির মূল ক্ষেত্র। তাই গ্রামবাংলার সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তির ওপরই বাংলাদেশের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে। কিন্তু এ কথা দুঃখজনক সত্য যে, এতকাল গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্পের যে গুরুত্ব তা এতকাল কেউ চিন্তাও করেননি। আমাদের যে কোন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা যে গ্রামবাংলাকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করতে হবে, এ কথাটাই সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করলেন। কারণ গ্রামপ্রধান বাংলার আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা ও তাদের শোষণ বঞ্চনা প্রতারণা থেকে মুক্তি দিতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়ন একান্তই জরুরী ও অপরিহার্য, এটাই বঙ্গবন্ধু সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোক গ্রামবাংলার বুকে বসবাস করে। এর মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিপেশার সাথে জড়িত। কিন্তু এই বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আবাসস্থল গ্রামবাংলা হাজার হাজার বছর ধরে অবহেলিত ও শোষিত হয়ে আসছে। অথচ এই গ্রাম থেকেই মোট জাতীয় সম্পদের শতকরা ৬৫ ভাগ সম্পদ উৎপাদিত হয়ে থাকে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, শোষণভিত্তিক আর্থসামাজিক কাঠামোর বদৌলতে গ্রামে অর্জিত সম্পদের সিংহভাগ অপহরণ করে শহরের মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান বিত্তবানে পরিণত হয়েছে। গ্রাম শুধুমাত্র উৎপাদন করে কিন্তু সেই গ্রামই এর ফল ভোগ করতে পারে না। বিগত প্রায় এক শতাব্দি যাবত আমাদের দেশে নগরপত্তন তথা নগরায়নের যে বিপুল কর্মকান্ড চলেছে তার খরচের মাশুল বা অর্থ সম্পদ গ্রামকেই

যোগান দিতে হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় শহরকে সমৃদ্ধির আলোকমালায় সুভাসিত করতে গিয়ে গ্রামগুলো নিঃস্ব রিক্ত শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। বহুযুগের একটানা নির্মম শোষণের ফলশ্রুতিতে 'সোনার বাংলা' নামে খ্যাত আমাদের দেশের গ্রামগুলো শ্মশানে পরিণত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে গ্রামের সাধারণ কৃষক মজদুর মেহনতী জনসাধারণ অর্দ্ধাহারে অনাহারে অশিক্ষায় কুশিক্ষায় ও রোগে শোকে জরায় ধুকে ধুকে মরছে। বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগেও আমাদের গ্রামীণ পরিবেশে সভ্যতার আলো এখনো গিয়ে পৌছায়নি বললেই চলে।

কৃষিজীবিকাই হলো আমাদের গ্রামীণ জীবনের প্রধানতম বা একমাত্র পেশা। এ পেশায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কৃষিজীবিদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের কৃষিব্যবস্থা একেবারেই অনুন্নত ও সেকেলে। বর্তমানকালেও শীর্ণদেহী বলদের কাঁধে লাঙ্গল জোয়াল জুড়িয়ে কৃষিকাজ করা হয়। নেই সার, ভালো বীজ, অষুধ—নেই সেচের ব্যবস্থা। ফলে জমিতে ফলন অত্যন্ত কম হয়। নেই ভূমিসংস্কারের কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা। কাগজে-কলমে যদিও সামন্ততান্ত্রিক বা জমিদারপ্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছে, তথাপি এখনো পর্যন্ত রয়েছে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার অবশেষ বা আধাসামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার রূপ জোতদারী, ভাগচাষ বা বর্গাপ্রথা প্রভৃতি শোষণভিত্তিক ব্যবস্থা। এর ফলে কৃষক সমাজ শোষণের দুষ্টক্ষতে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। শোষণের শিকার হয়ে তাই এরা দিনে দিনে সর্বশান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ছে। অপর দিকে জোতদার মহাজন ফড়িয়া ও বৃহৎ কৃষক পরিবার ধনসম্পদে ফুলেফেঁপে উঠছে। এটাই হলো গ্রামীণ অর্থনীতির পটভূমি।

গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধানতম ক্ষেত্র কৃষিকর্মে নিয়োজিত কৃষক সমাজকে আমরা চারভাগে ভাগ করতে পারি, যথাঃ ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদে কৃষক, মাঝারি কৃষক ও বৃহৎ কৃষক। জোতদার ও বৃহৎ ধনিক পরিবার কৃষকের আওতায় পড়ে না। এরা কৃষিকাজে অনুপস্থিত। এরা বর্গাপ্রথায় উৎপাদনে মালিকানাস্বত্বের অধিকারী। সাধারণতঃ এই শ্রেণীই আবার শহরে শিল্পমালিক, বণিক, আমলা, আইনজীবী প্রভৃতি পেশার সাথে সম্পৃক্ত।

ভূমিহীন কৃষকের হাতে জমি থাকার প্রশ্নই আসে না। ক্ষুদে ও মাঝারি কৃষকের হাতে শতকরা যথাক্রমে .০৫ থেকে ৮ বিঘা এবং ৯ বিঘা থেকে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমি রয়েছে। বৃহৎকৃষকের হাতে রয়েছে ২৬ বিঘা থেকে ৫০ বা তারও অধিক জমি। আর জোতদার, যারা সংখ্যায় কৃষিভূমি মালিকদের মধ্যে শতকরা ১-৩ ভাগ, এদের হাতে রয়েছে ৫০ বিঘা থেকে কয়েকশত বিঘা কৃষিজমি।

আমাদের দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৬৫ ভাগ। ক্ষুদে ও মাঝারি কৃষকের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১৮ ও ১৯ ভাগ। বৃহৎকৃষকের সংখ্যা

শতকরা ৫ ভাগ আর বৃহৎ কৃষক পরিবার বা জোতদারের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩ ভাগ। ক্ষুদে ও মাঝারি কৃষকদের মোট জমির পরিমাণ শতকরা ২৩ ভাগ। আর বৃহৎ কৃষক পরিবার ও জোতদারদের মোট জমির পরিমাণ শতকরা ৭৭ ভাগ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের মোট কৃষিজমির শতকরা ৭৭ ভাগের মালিক মাত্র শতকরা ৮ জন লোক। ক্ষুদে ও মাঝারি কৃষকদের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাচ্ছে যে, ভূমিহীন কৃষকরা ঐ ৮% ভাগ লোকের জমিতে বর্গাচাষ বা শ্রমবিক্রয় করে বেঁচে আছে।

অপরদিকে প্রকৃতিনির্ভর চাষাবাদের ফলে সময় মতো বৃষ্টি না হলে বা অনাবৃষ্টি খরা অতিবৃষ্টি বন্যা, পোকামাকড়ের প্রকোপ, সেচের অভাব, সারের অভাব, অষুধের অভাব, ভালো বীজের অভাব, টাকার অভাবে জমি নিড়ানো হয় না, ইত্যাদি কারণে ক্ষুদে কৃষক, বর্গাদার ও মাঝারি কৃষকদের জমিতে ফলন তেমন হয় না। সংসারের খরচ জোটে না। ফলে ক্ষুদে ও মাঝারি কৃষকরা বৃহৎ কৃষক ও জোতদারদের নিকট বা অন্য কোনো সুবিধাবাদী মহাজন সুদখোর প্রভৃতিদের নিকট জমি বিক্রি করে বা বন্ধক রেখে সংসার চালাতে বাধ্য হয়। এভাবে প্রতিবছর ক্ষুদে কৃষকরা ভূমিহীন কৃষকে এবং মাঝারি কৃষকরা ক্ষুদে কৃষকের খাতায় নাম লেখাচ্ছে।

আমাদের দেশে মোট কৃষিজমির তুলনায় অত্যাধিক জনসংখ্যার দরুন কৃষিজমির আয়তন নানান ছোটো ছোটো খন্ডে বিখন্ডে বিভক্ত। ফলে কৃষিজমির খামারের আকার খুবই ক্ষুদ্র। ছোটো খামারের গড় আয়তন ৩ থেকে ৫ বিঘার মতো। মাঝারি খামারের গড় আয়তন ১২ বিঘার মতো। আর বৃহৎ খামারের গড় আয়তন ৪০/৪৫ বিঘার মধ্যে। এই ক্ষুদ্র খন্ড বিখন্ডে বিভক্ত; ছোটো বড়ো খামার যেহেতু ব্যক্তিমালিকানায়, সেহেতু যৌথভাবে খামারভিত্তিক চাষাবাদ করা এখানে সম্ভব হয় না।

বর্তমানে গ্রামবাংলার কৃষিউন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সব সরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তা মূলতঃ মাঝারি কৃষক, বড়োকৃষক ও জোতদারদের সেবায় নিয়োজিত। কৃষি ঋণ, সার, বীজ, অষুধ, যা কিছু সরকার থেকে বরাদ্দ করা হয় কৃষকদের জন্যে, তার সবকিছুই গ্রামীণ প্রভাবশালী, টাউট, বাটপাড়মহল স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের যোগশাজসে ভোগ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত কৃষক বা দরিদ্র কৃষকরা এ থেকে বঞ্চিত হয়। অপরদিকে জনসংখ্যাধিক্যের ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি আমাদের কৃষিজমি বা খামারের আয়তনও ক্ষুদ্র হয়ে পড়ছে। অপরদিকে জমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হওয়ার ফলে এ সমস্ত জমির সীমানা চিহ্নিতকরণ রেখা বা আঁল-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, জমির আঁল তৈরির জন্যে যে পরিমাণ জমি সারা বাংলাদেশে অপচয় হচ্ছে তার পরিমাণ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার আয়তনের সমান। এর আয়তন অবশ্য ক্রমেই

বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যতীত প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন খাল খনন, রাস্তাঘাট বসতবাড়ি নির্মাণ ও অন্যান্য কারণে কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এ ছাড়াও ফারাক্কার কারণে উত্তর বঙ্গের কয়েকটি জেলার জলের স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে এবং কৃষি জমিগুলো উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে এবং ফারাক্কার প্রভাবে বাংলার পদ্মা যমুনা মেঘনা আঁড়িয়াল খাঁ মধুমতি গড়াই কুমর প্রভৃতি নদনদীর গভীরতা কমে যাচ্ছে; স্রোতের তীব্রতা কমে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ঐ সব নদনদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত জল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ছাপিয়ে উত্তরদিকে প্রতিবছর অনেকখানি এগিয়ে আসছে। এই লবণাক্ততার প্রভাবেও কৃষিজমির উৎপাদন ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে। এটাই হলো গ্রামীণ আর্থব্যবস্থার একটা সাধারণ চিত্র। এ অবস্থার অবশ্যসম্ভাবী পরিণতি হিশেবে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য কৃষির মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ছে। এর ফলে গোটা আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার ৬৮ হাজার গ্রামই আজ ক্ষুধা, অপুষ্টি, দারিদ্র্যতা, অভাব ও হতাশার তিমিরে নিমজ্জিত হয়েছে। কেনো এমন হচ্ছে তার একটা ছোটো পর্যালোচনা দেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কৃষি পেশার সাথে জড়িত থাকলেও জমির একর প্রতি ফলন অত্যন্ত কম হয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, পোকার আক্রমণ, ভালো বীজের অভাব, সেচের অভাব, অষুধের অভাব, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির অভাব, কৃষি বিষয়ে অশিক্ষা ইত্যাদি কারণে কৃষি উৎপাদন কম হয়। তাছাড়া এভাবে প্রতি বছর চাষাবাদ করার ফলে মাটির উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এর ওপর রয়েছে অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপ। শিক্ষার অভাব ও ধর্মীয় কুসংস্কারের শিকার হয়ে এদেশের মানুষ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উৎসাহিত নয়। যার ফলে অভাবী দেশের ওপর ঐ অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপ পড়ে খাদ্যসমস্যাকে আরো তীব্রতর করে তুলেছে। অপরদিকে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, প্রাকৃতিক নানান দুর্যোগ, পোকামাকড়ের আক্রমণ, ব্যাপকহারে খাদ্য চোরাচালান ও গুদামজাতকরণের ফলে খাদ্যশস্যের সরবরাহ হ্রাস পেয়ে খাদ্য ঘাটতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ২৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ঘাটতি থেকেই যায়।

আমাদের দেশে প্রতি বছর ৩% চক্রবৃদ্ধি হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প-কলকারখানা ও অন্যান্য কুটির শিল্পের অপ্রতুলতার কারণে কাজের সুযোগ না থাকায় প্রতি বছর এই বাড়তি জনসংখ্যাকে শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় কৃষিজীবীদের সংখ্যা অধিক হওয়ার ফলে গ্রামবাংলায় বেকারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি সমীক্ষার মতে,

গ্রামবাংলায় প্রায় দু'কোটি লোক বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত হচ্ছে।

সামন্ততান্ত্রিক বা জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হলেও এদেশে আধাসামন্তবাদী ব্যবস্থা বিদ্যমান। পাকিস্তান আমলে ভূমিস্বত্বের যৎসামান্য সংস্কার করা হলেও বৃহত্তর কৃষকসমাজের তাতে বিন্দুমাত্র উপকার হয়নি। এ দেশে ক্ষুদে ও মাঝারি কৃষকদের মালিকানায় জমি রয়েছে মাত্র ২৩% অথচ মাত্র ৮% লোকের দখলে রয়েছে ৭৭% ভাগ জমি। বাকি ৬০% ভাগেরও ওপরে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর রয়েছে। এই হলো বাংলাদেশের ভূমিস্বত্বের ব্যবস্থা। এর ফলে প্রকৃত কৃষকরা যারা ভূমিহীন (ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষী) কৃষক, মালিকানাস্বত্বহীন এই বৃহত্তর কৃষকসমাজ কৃষি কাজে কোনোই উৎসাহ পায় না। এদের রক্ত জল করা শ্রমের বদৌলতে বৃহৎ কৃষক ও জোতদাররা লাভবান হচ্ছে। তারা (কৃষকরা) শোষিত হচ্ছে। সুতরাং এই অসংগতিপূর্ণ ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ফলে কৃষি উৎপাদন কম হচ্ছে।

বাংলার গ্রামীণ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সৎ নিষ্ঠাবান ও যোগ্য নেতৃত্বের দারুণ অভাব। গ্রামবাংলার অধিকাংশ লোক নিরক্ষর এবং তারা দরিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করছে। গ্রামীণ সমাজ ধনিক (বৃহৎ কৃষক, মহাজন, ফড়িয়া, দালাল) ও দরিদ্র কৃষক-মজদুর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই ধনিকশ্রেণী যারা অর্দ্ধশিক্ষিত, কিন্তু গ্রামীণ রাজনীতিতে খুবই ধূরন্ধর ও কূটিল। এরা নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে এই বিরাট দরিদ্রশ্রেণীকে নানা প্রকার বিভেদের মধ্যে জড়িয়ে তাদের শোষণ করে চলেছে। সুতরাং এখানে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না। সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের নেতৃত্বে এই ধনিকশ্রেণী থেকে আগত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মাতবর, মেম্বার, মামলাবাজ, দাঙ্গাবাজ, টাউট বাটপাড় শ্রেণীর সমাগম এতোই প্রকট যে, তাদের কূটকৌশলে বৃহত্তর দরিদ্র কৃষক সমাজ আবদ্ধ হয়ে ধুকে ধুকে মরছে।

শিক্ষার অভাবই গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অন্যতম মূল কারণ। গ্রামের ধনিকদের মধ্যে অল্পসংখ্যক বাদে কৃষিকাজের সাথে জড়িত লোকেরা একেবারেই নিরক্ষর। ফলে তারা ভূমি তথা কৃষিউন্নয়নের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ উদাসীন। সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার অভাবে আমাদের কৃষিউন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

গ্রামবাংলার কৃষক সাধারণের সঞ্চয়ের ক্ষমতা নেই বললেই চলে। খেয়ে-পরে বাঁচাই এখানে দুষ্কর। ফলে সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি বা মূলধন সৃষ্টির অভাবে আমাদের কৃষিউন্নয়নের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না।

গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক মৌলিক কাঠামো ও সামাজিক ব্যবস্থা সামন্তবাদী শোষণভিত্তিক কর্মকান্ডের ফলে অত্যন্ত সেকেলে চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন। এ ব্যতীত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ সব সমস্যা

গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করছে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ধর্মীয় ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের ক্রিয়াকলাপের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক পথ ও চেতনাকে ব্যাহত করছে। দরিদ্র অজ্ঞ অশিক্ষিত জনসাধারণের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথার সুযোগ গ্রহণ করে আলেম পুরোহিত ও অন্যান্য শোষক প্রতারকশ্রেণী শোষণ অবিচার অন্যায়কে ধর্মের নামে জায়েজ করে নিজেদের সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করে থাকে। এই ধর্মীয় ও শোষকশ্রেণী বৃহত্তর শ্রমজীবি মানুষকে ধর্মান্ধতার বেড়াজালে আবদ্ধ করে অদৃষ্টবাদী, রক্ষণশীল মনোবৃত্তি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের জন্ম দিয়েছে, যে পরিবেশ মানুষের ইহজাগতিক উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের উৎসাহ ও উদ্দীপনার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করছে; যা দেশের সামগ্রীক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক তৎপরতায় একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

এ ব্যতীত রয়েছে, উপর্যুপরি প্রাকৃতিক নৈসর্গিক বিপর্যয়। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে প্রতিবছর আমাদের দেশে বিপুল পরিমাণ শস্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়। বাংলার চির অভিশাপ বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আজো পর্যন্ত তেমন কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে গোটা বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। পাকিস্তান সরকারের হিংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে। সেই ফারাক্কা বাঁধ বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামীণ তথা সামগ্রীক অর্থনীতির ওপর হুমকী সৃষ্টি করেছে। ঐ বাঁধের প্রভাবে পদ্মা-যমুনা ও অন্যান্য নদনদীর জলের প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে নদী ও শাখানদী খালসমূহ ভরাট হয়ে যাচ্ছে, সেচ ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু সরকার ভারত সরকারের সাথে একটা ফলপ্রসূ স্থায়ী মিমাংসায় উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন সরকার নিজেদের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে ভারতের সাথে ফারাক্কা ও অন্যান্য সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেনি। ফলে গোটা অর্থনীতি ও সীমান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

উপরোক্ত কারণসমূহই হচ্ছে মোটামুটি গ্রামবাংলার অর্থনীতির অব্যবস্থার কারণ। এগুলো বঙ্গবন্ধু হৃদয় দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি দেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি জানতেন শতকরা ৯০ ভাগ লোকই গ্রামের মধ্যে বসবাস করে এবং বাংলার গোটা অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। গ্রামবাংলার মেহনতী দরিদ্র সাধারণই বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অথচ তারাই হচ্ছে অত্যাচারিত লাঞ্ছিত শোষিত। সুতরাং এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নই ছিলো

তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি জানতেনঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবি মেহনতী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত না হলে বাংলার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংহত ও সুদৃঢ় হবে না।

এ কারণেই বঙ্গবন্ধু গ্রামবাংলার তথা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ করে বাংলার প্রাণ কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটিয়ে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে 'বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম-সমবায় প্রকল্প' চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

২. বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম-সমবায় প্রকল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ গ্রামীণ অর্থনীতিভিত্তিক। কারণ মোট জনসংখ্যার ৯০ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষিকাজের ওপরই তারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তাছাড়া মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৬৫ ভাগ অর্জিত হয় কৃষি থেকে। বঙ্গবন্ধুর আর্থসামাজিক ব্যবস্থা তাই সংগতকারণেই গ্রামীণ কৃষিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কৃষি অর্থনীতির আওতায় খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন ও ভূমিসংস্কারের সাধন করাই বঙ্গবন্ধুর আর্থসামাজিক দর্শনের মূল ভিত্তি। আধাসামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার অবসান বা কৃষিক্ষেত্রে শোষণকে উৎপাটিত করার লক্ষ্যে—স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্যে এবং সকল কর্মক্ষম গ্রামীণ জনতার সমবেত শ্রমশক্তিকে উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োজিত করে এবং উৎপাদনোপকরণসমূহকে পূর্ণভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত করে গ্রামবাংলার দরিদ্র দীনদুখী শোষিত কৃষক জনতার মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু 'বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম-সমবায়' কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু অতঃপর দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ 'কো-অপারেটিভ আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙ্গালী কো-অপারেটিভ এবং এটা হবে কম্পালসারী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ।'

গ্রামীণ কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা—যেখানে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে সৃষ্টি হয়েছে অবিচার অত্যাচার, বর্ধিত হয়েছে অন্যায় জুলুম শোষণ প্রতারণা, বাসা বেঁধে আছে শঠতা চালাকী ফাঁকিবাজী মতলববাজী। সেই ঘুণে ধরা অভিশপ্ত শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে গড়তে হবে।

বঙ্গবন্ধু বললেনঃ 'নিউ সিস্টেম করতে হবে এবং একটা, দুইটা, তিনটা গ্রাম নিয়ে কো-অপারেটিভ করতে হবে এবং এটা হবে বাধ্যতামূলক কো-অপারেটিভ। এতে কোনো কিন্তু-টিন্তু নেই। এটাকে পুরোপুরি সাকসেসফুল করতে হবে। একাজ, যদি ডিস্ট্রিক্টে একটা কো-অপারেটিভ মানুষ দেখে যে, এই দেশের মানুষের

এই উপকার হয়েছে, তাহলে আপনার আর করতে হবে না। মানুষ নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের এটা করে দাও। পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় ৬৫ হাজার গ্রামে আমরা এই কো-অপারেটিভ গড়ে তুলবো। আমার বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। সে-জন্যে আমরা নতুন ল্যান্ড সিস্টেমে আসতে যাচ্ছি। সে জন্যে একমাত্র উপায় আছে যে, আমরা যে আজকে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি, এটা যদি গ্রো করতে পারি আস্তে আস্তে এবং এটাকে যদি আমরা ডিষ্ট্রিক্ট, থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে বিশ্বাস করি।' বঙ্গবন্ধুর এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় গ্রামকেই প্রশাসনিক ও উৎপাদন ইউনিট হিশেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে শোষণ বঞ্চনা বৈষম্য ও অসাম্য থাকবে না—একটি সুখীসমৃদ্ধশীল শোষণহীন গ্রামবাংলার মাধ্যমে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে উঠবে।

বঙ্গবন্ধুর এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারার তাৎপর্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে বাংলার ভূমি, ভূমিবিন্যাস, উৎপাদন পদ্ধতি ও সামাজিক কাঠামোর পটভূমি সম্পর্কে একটু বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থার ইতিহাস—নির্মম শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস। অতীতে এদেশের ওপর দিয়ে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র প্রভৃতির ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে। রাজরাজড়ারা রাজকোষ ভর্তি করার উপায় হিশেবে ভূমিকে ব্যবহার করেছে। তাদের অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে সামন্ততন্ত্র ও অভিজাতশ্রেণী। এরাই শোষকদের বা রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় কৃষকদের শোষণ করেছে। সর্বশান্ত নিঃস্ব রিক্ত সর্বহারা হয়েছে কৃষক সমাজ। মোগল পাঠান আমলেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শেরশাহ্ ও আকবর বাদশাহ ভূমিজরীপ, ভূমিকর এবং ভূমির শ্রেণীবিন্যাস করলেও তা দরিদ্র কৃষক সমাজকে মুক্তির পথ দেখাতে পারেনি। ১৭৭২ সালের পাঁচশালা, ১৭৭০ সালের ভূমি বন্দোবস্ত আইন পাশ করা হলেও তা ফটকাবাজদের কবলে পড়ে স্ফীত নিলাম ডাকের মূল্য ও লাভ আদায়ের লক্ষ্যে প্রজাদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন নিপীড়ন ও অতিমাত্রায় শোষণকার্য চলতে থাকে যার অনিবার্য পরিণতি হিশেবে ১৭৭৬ সালে মহাদুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালীসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালে জনমনে তথা কৃষক সমাজে ব্যাপক বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসনের জন্যে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। কিন্তু তাতে জমিদার প্রথার অভিশাপ মোচন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে ১৯৪০ সালে 'ফ্লাড কমিশনে'র সুপারিশ মোতাবেক জমিদারী প্রথা বিলোপ ও ভূমির ওপর প্রজাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে প্রজাসাধারণকে সরাসরি সরকারের অধীনে আনার প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে উক্ত সুপারিশ শিকেয় উঠে

থাকে। ১৯৫০ সালে পূর্ব পকিস্তান সরকার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করে। কিন্তু আইনের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে আধাসামন্তবাদী ব্যবস্থাকেই প্রকারান্তরে জিইয়ে রাখা হয়েছে,ফলে কৃষকসাধারণের সুখসমৃদ্ধি বিধান এখানে গৌণ হয়ে পড়েছে। তাদের জীবনের দারিদ্র্যতা শোষণ উৎপীড়ন দূর হলো না। ভূমি পূর্বের মতোই মুষ্টিমেয় ধনিক জোতদারদের স্বার্থে সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ হিশেবে পরিগণিত হলো।

বঙ্গবন্ধু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কার্যকর করার জন্যে জনবহুল, ক্ষুদ্রায়তন কৃষি অর্থনীতিভিত্তিক বাংলাদেশে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতাত্তোরকালে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা ও বকেয়া খাজনা-ঋণ মওকুফ করেন এবং ভূমিহীন কৃষকদের কৃষিভূমি লাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ভূমিমালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘায় নির্ধারণ করেন। পরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেনঃ 'সর্বোচ্চ ভূমিমালিকানার সীমা ৫০ বিঘায় নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করে সমস্ত কৃষিজমিকে গ্রাম সমবায়ের অধীনে ন্যস্ত করে চাষাবাদের ব্যবস্থা করবো। এবং পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ সীমাকে আরো নিচে নামিয়ে আনবো যাতে আমার দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকরাও কিছু জমির মালিকানা পায়।' এ লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে বিনা খাজনা ও বিনা সেলামীতে ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত ও সরকারী খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থাও করা হয়।

বাংলাদেশে কৃষিভূমির পরিমাণ ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ একর। এর মধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২ কোটি ৯১ লক্ষ একর। মোট কৃষকের ৬৫% ভূমিহীন। ২৭% কৃষকের হাতে জমি রয়েছে মোট কৃষিজমির ২৩%। আর বাকী ৮% বৃহৎ কৃষক জোতদারদের হাতে রয়েছে মোট কৃষি জমির ৭৭% ভাগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের কৃষিজমির সিংহভাগ রয়েছে অকৃষকদের হাতে, আর প্রকৃত কৃষকরা ভূমি থেকে হয়ে আছে বঞ্চিত, ফলে কৃষকদের এক বিরাট অংশ বেকার হয়ে পড়ে আছে।

এই বিপুল জনসমষ্টিকে উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়াতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন করা কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। এই অসম্ভবকে সম্ভব করার দায়িত্ব সর্বপ্রথম গ্রহণ করলেন বঙ্গবন্ধু। ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সামাজিক সমষ্টিগত স্বার্থকে একত্রিত করে তিনি নবচেতনার বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিলেন গ্রাম সমবায় প্রকল্পের মাধ্যমে। ভূমিব্যবস্থাকে ব্যক্তিমালিকানায় রেখে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর উন্নতি সম্ভব নয়। সেই জন্যে ভূমিমালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানাকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ না করেও তিনি কৃষিভূমিকে বাধ্যতামূলক সমবায়ী মালিকানা অর্থাৎ সামাজিক মালিকানায় নিয়ে এসে ঘোষণা করলেনঃ 'জমি নেবো না। জমি থাকবে। ক্ষেতখামারে কাজ না করলে কেউ

জমির উপর থাকতে পারবেন না। সেখানে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। লেট আস স্টার্ট। ওয়ান্স উই আর সাকসেসফুল এবাউট দিস মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি, দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে।'

প্রচলিত সমবায়ের ভেতর মানুষ মানুষকে শোষণ বঞ্চনা করার যে অলিখিত রীতিনীতি ও পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু এই শোষণের চোরাপথকে চিরতরে বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেন। তিনি বললেনঃ 'জমির মালিকের জমি থাকবে, কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে। যে মানুষ কাজ করতে পারে তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখি কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, টেষ্ট রিলিফের টাকা যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আমি আজকে ঘোষণা করছি, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে একহাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারী কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি পাবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গর্ভনমেন্টের হাতে।'

'বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম-সমবায় প্রকল্পের' কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্যঃ-

১. পাঁচশত থেকে এক হাজার পরিবার সমন্বয়ে গ্রাম সমবায় গঠন।

২. এই সব পরিবারের সমস্ত কৃষিজমি সমবায়ের অধীনে ন্যস্তকরণ।

৩. প্রতিটি গ্রাম—সমবায় পরিচালনার জন্যে সমবায় সভ্যদের ভোটে একটি নির্বাচিত পরিষদ গঠন। (প্রত্যেক কর্মক্ষম ভূমিহীন কৃষক-মজদুর, মালিক-কৃষক বাধ্যতামূলক সমবায়ের সভ্য হবে।)

৪. মালিক—কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক-মজদুর সমবায়ের কাজের জন্যে নগদ পারিশ্রমিক পাবেন।

৫. সমবায় ক্ষেতখামারে ও অন্যান্যভাবে উৎপাদিত ফসল সমান তিনভাগে ভাগ করে ভূমিমালিক, ভূমিহীন কৃষক-মজদুর বা সমবায় ও সরকারের মধ্যে বিতরণকরণ। (সরকারের প্রাপ্য অংশ স্থানীয় ধর্মগোলায় রাখতে হবে।)

৬. সরকার সমবায়ের কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যাবতীয় উপকরণ বা সাজসরঞ্জাম স্বল্পমূল্যে বা ঋণে বা বিনামূল্যে সমবায়কে প্রদান করবে।

৭. সমবায় সভ্যদের যৌথ চাঁদা বা শেয়ারে গঠিত মূলধনে ও সরকারের মূলধন ও ঋণে প্রতিটি সমবায়ের অধীনে নানান কুটির শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

৮. সরকার ধর্মগোলায় রক্ষিত সম্পদের মধ্য থেকে একটি অংশ নিয়ে নেবে, বাকি অংশ সমবায়ের নানান দুর্যোগ ও প্রয়োজন মোকাবিলার জন্যে জমা থাকবে।

৯. সরকার গ্রাম-সমবায় এলাকার আইন-শৃংখলা, রাস্তাঘাট, অন্যান্য

যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, সেচ, সার, বীজ, কীটনাশক অষুধ, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ করবে।

১০. সমবায় তার সভ্যদের প্রদানকৃত শেয়ার মূলধন ও সরকারের ঋণ বা অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে যে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য ও ছোটো ছোটো কল-কারখানা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারবে।

১১. প্রতিটি গ্রাম সমবায় উৎপাদন ও প্রশাসনিক ইউনিটরূপে গড়ে উঠবে।

১২. কয়েকটি গ্রাম সমবায় সমন্বয়ে একটি করে 'আঞ্চলিক সমবায় কার্যালয়' গড়ে উঠতে পারে তবে থানা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হবে গ্রাম সমবায়সমূহের কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

ক. আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তারা গ্রাম সমবায়ের পরিচালনা পরিষদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। তবে উভয় কার্যালয়ে সরকারের তরফ থেকে একজন ও জাতীয় দলের থেকে একজন প্রতিনিধি সার্বক্ষণিকভাবে পরিদর্শক হিশেবে থাকবেন। তবে এদের ভোটাধিকার থাকবে না।

* মূলতঃ প্রতিটি গ্রাম সমবায় স্থানীয়ভাবে 'সমবায় সরকার' হিশেবে পরিগণিত হবে। সমবায়ের যাবতীয় নিরাপত্তা শৃংখলা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের দায় দায়িত্ব সমবায় সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

* সমবায় তথা বিভিন্ন সমবায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-বিবাদ মিমাংসার জন্যে আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'সমবায় ট্রাইবুনাল' গঠিত হবে।

এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে বাংলাদেশের গ্রামীণ আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ। এর ফলে আধাসামন্তবাদী ভূমি ও আর্থব্যবস্থার শোষণ প্রতারণার অবসান ঘটবে। ভূমিহীন কৃষক মজদুর ও অন্যান্য দরিদ্র জনসাধারণ পাবে তাদের জীবনের সার্বিক নিরাপত্তা।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের সকল মানুষের মধ্যে জাগ্রত হবে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতাবোধ। ভূমিহীন কৃষক মজদুর ও ক্ষুদে কৃষকরা এ ব্যবস্থায় উৎপাদন কার্যে নিঃসন্দেহে বিপুলভাবে উৎসাহিত হবে। জমিতে সমাজীকরণ চাষাবাদের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কেন না, বিক্ষিপ্তভাবে টুকরা জমিতে ধরা যাক যেখানে লাঙ্গল লাগে দশখানা, সেখানে সমাজীকৃত বিরাট খামারে ঐ দশখানা লাঙ্গলের বেশি লাগবে না। এ ব্যতীত বিরাট খামারে বৈজ্ঞানিক বা যান্ত্রিক চাষাবাসের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে সব মিলিয়ে বিরাট বিরাট খামারভিত্তিক চাষবাসের কারণে এবং বিরাট শ্রমশক্তির যৌথ প্রচেষ্টায় উৎপাদিত হবে বিপুল সম্পদ।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বললেনঃ 'আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ বেশি ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি

দুনিয়ার সেরা জমি, আমি কেন সেই জমিতে দ্বিগুণ ফসল ফলাতে পারবো না'। এ জন্যেই তিনি বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম-সমবায় আন্দোলনের ডাক দিলেন। সূচনা করলেন গ্রামীণ আর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক কার্যক্রম, উৎপাদন বৃদ্ধির বিপ্লব। এ ব্যতীত গ্রামের শিক্ষা, গ্রামের স্বাস্থ্য, গ্রামের বিচার, গ্রামের আইন শৃংখলা, গ্রামের বাসস্থান, অর্থাৎ গোটা গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সবকিছুই থাকবে গ্রাম সমবায়ের হাতে। এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জীবনের কায়েমী স্বার্থের দুর্গ মাতবর-মোড়ল-মেম্বার-চেয়ারম্যান-জোতদার-মহাজন-সুদখোর-ফড়িয়া-দালাল ও ধর্মীয় টাউট-বাটপাড়দের রাজত্বের অবসান ঘটবে। এত দিনকার আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত লাঞ্ছিত শোষিত দরিদ্র শ্রমজীবি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে নতুন সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে এবং একটি স্বচ্ছল সুখী সমৃদ্ধশালী গ্রামীণ জীবনব্যবস্থায় নবদিগন্তের সুত্রপাত ঘটবে এবং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

গ্রাম-সমবায়ের উক্ত ধারা তথা উৎপাদনের বিপ্লব অবিরামগতিতে চলতে থাকলে এমন একদিন আসবে যখন জমির মালিকানাস্বত্বের প্রতি কারো লোভ-লালসা থাকবে না। কারণ একজন মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তা-ই যদি অনায়াসে সে পেয়ে যায় তাহলে তার মালিকানাস্বত্বাধিকার তারই কাছে হবে গৌণ। এ পর্যায়ে সমাজ অগ্রসর হওয়ার পরই সরকার সমস্ত ভূমিব্যবস্থা বা উৎপাদনের যাবতীয় উপায়সমূহকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসবে।

বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলামঃ 'গ্রামীণ বৃহৎ ধনিক কৃষক জোতদার পরিবার থেকেই মূলতঃ বৃহৎ ও ছোটো-বড়ো লাভজনক শিল্প কারখানার মালিক, বণিক, সামরিক-বেসামরিক আমলা, রাজনীতিক আইনজীবি তথা তথাকথিক সম্ভ্রান্তশ্রেণীর আগমন ঘটেছে, যারা সম্পদে বৈভবে ও যাবতীয় ক্ষমতায় বলিয়ান, যারা বর্তমান ধনতান্ত্রিক শোষণবাদী সমাজ কাঠামোকে জিইয়ে রেখেছে, তারা তো নিশ্চয়ই বসে থাকবে না। এদের সম্পর্কে আপনি কি কিছু চিন্তাভাবনা করেছেন ?

বঙ্গবন্ধুর জবাবঃ 'আমি বিশ্বাস করি, তারা আমাকে বুঝবেন। তাদের বুঝবার সুযোগ দিয়েছি। তাদের মেন্টালিটি বদলাবার সুযোগ দিয়েছি। সেই সুযোগ তারা যদি সদ্ব্যবহার না করে তাহলে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা রেখেছি। তবে আমি বলপ্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাস করি না। তারাও এদেশের, এ সমাজের, আমার বাংলার মানুষের বাবা-নানা-আত্মীয়-ভাই-ব্রাদার। তাদের সামান্য ত্যাগের বিনিময়ে যদি বাংলার দুখী মানুষ দু'বেলা পেটপুরে খেতে পায়, বস্ত্র পায়, আশ্রয় পায়, কাজ পায়, অন্যান্য কিছু কিছু পায় তাহলে এর চেয়ে বড়ো আনন্দের

আর কী আছে। তবু যদি এরা তা না করে, ষড়যন্ত্র করে এই প্রোগ্রাম বানচাল করতে চেষ্টা করে, তাহলে আমাকে দুঃখজনক বিকল্প পথ অবশ্যই নিতে হবে। .....মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের দিয়ে রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি করেছি। এরপর মুক্তিযোদ্ধাদের ডেকে বলবো, আসো, তোমরা দেশ স্বাধীন করেছো, তোমরা দেশ চালাও, সমাজতন্ত্র করো। ......গত তিন বছরে আমার কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছে, জেলে পুরা হয়েছে, চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, হাইজ্যাকার বানানো হয়েছে, অপমানিত করা হয়েছে, এ সবকিছু করা হয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের ইংগিতে, তাদের এজেন্টদের দিয়ে, যারা সমাজের বিভিন্ন স্থানে ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে। ......আমি যদি এই মুক্তিযোদ্ধাদের আবার বলি, তোমরা তোমাদের অধিকার আদায় করে নাও, বদমাশদের শায়েস্তা করো তাহলে দেখবে বিপ্লব ঘটে গেছে, ঐ চক্র খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে।'

গ্রাম সমবায়ের কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে কী কী ফল অর্জিত হতে পারতো বা পারে সে বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা
ক. আমলাতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
খ. গণপ্রতিনিধিত্বশীল প্রশাসনঃ থানা প্রশাসনিক ও জেলা গভর্নর প্রকল্প

ক. আমলাতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের ইতিহাস, এর গতিপ্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, যুগে যুগে প্রশাসনিক চরিত্র পরিবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্রের চরিত্র ও চেহারার পরিবর্তন-বিবর্তন হয়েছে, এর গতিপ্রকৃতিও ভিন্নতর হয়েছে। প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্র ও প্রাচীন রোমের 'ট্রাম ভাইরেক্ট' পদ্ধতির মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। সেই থেকে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দি থেকে সামন্ততন্ত্রের শেষকাল পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের যে ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, এক কথায়, ততোদিনে আমলারা চিরকালের শোষণ প্রক্রিয়ায় শোষকদের ক্রিড়নক-সেবাদাস থেকে মাইনে করা ক্ষমতাবান শিক্ষিত কৌশলবাজ সম্ভ্রান্তশ্রেণী হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে বর্তমান ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজের বিচিত্র কর্মকান্ডের জটিলতায়ই আমলাতন্ত্র একটি পৃথক অভিজাতশ্রেণীরূপে সমাজরাষ্ট্রিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

যারা বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, তারা মনে করেন যে, আমলাতন্ত্রের অবাধ ও সীমাহীন ক্ষমতা ও তথাকথিত টাইপড্ কর্মদক্ষতার মাধ্যমেই কেবলমাত্র সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব। অথচ সমাজ বিকাশের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় এ মতবাদের গোড়ার কথা হলো, উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের কর্মধারার ভিন্নতর পরিণতিতে আমলাতন্ত্রের জন্ম-সভ্যতার অগ্রগামিক জটিলতার ফলে কায়িক ও মানসিক শ্রমের তুলনামূলক ব্যবধান বর্ধিত হওয়ার অনিবার্যধারায় মানসিক শ্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা প্রশাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সুতরাং আমলাতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটেছে ধনতান্ত্রিক সমাজসভ্যতার ছত্রছায়ায়। কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে শাসন করা, শোষণ করা, দাবিয়ে রাখা। আর আমলারা হচ্ছে এই সমাজসভ্যতার তথা শাসন-শোষণকার্যের বাস্তবায়ক শক্তি।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ আমাদের দেশে শাসন ও শোষণকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে আমলাতান্ত্রিক 'স্টিলফ্রেম' গড়ে তোলে। সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেখানে দুর্বল ও অসহায় সেখানেই আমলাতন্ত্রের প্রচন্ড প্রভাব। কারণ সমাজের

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অশিক্ষা অজ্ঞতা ও বুদ্ধিগত দৈন্যতার থেকেই জন্ম নেয় আমলাতন্ত্রের অপ্রতিহত শক্তি ও মদমত্ততা। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে সুকৌশলে জনগণকে দূরে রেখে নিজের ঠাঁট-ডাট-প্রভাব-প্রতিপত্তি-ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যে শাসক-শোষকদের ছত্রছায়ায় এমন কোনো পথ নেই যা তারা অবলম্বন করে না। কৌশলে আবার শাসক-শাসিতের মধ্যের মৌল ব্যবধান আড়াল করার জন্যে এরা কৃত্রিম গণমুখি সাজার অপপ্রয়াস চালায়। তাদের নিয়োগ থেকে শুরু করে, ট্রেনিং, কানুন, ক্ষমতা, ব্যবহার বিধি, এমন কি অবসর গ্রহণের পরেও তারা বিশেষ বৈশিষ্ট্যতা ও সম্মানে সমাজের আর দশজনের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা।

উত্তরাধিকারসূত্রে সেই বৃটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে পাকিস্তান পেরিয়ে বাংলাদেশেও আমরা আমলাতন্ত্র পেয়েছি। জনগণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন, জনগণের প্রতি বিতশ্রদ্ধ, জনগণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা কায়েমী স্বার্থের পূজারী-ধারক-বাহক এবং ব্যক্তিস্বার্থে অন্ধ এই আমলাতন্ত্র দিয়ে সাধারণ দীন দুঃখী মেহনতী শ্রমজীবি ব্যাপক শোষিত-ভাগ্যাহত জনগণের কোনোই কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। এই গণবিরোধী, সংকীর্ণ স্বার্থবাদী, শোষণবাদী সমাজের পূজারী আমলাতন্ত্রকে আমরা আমাদের প্রশাসনের সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। বাস্তববিবর্জিত, স্থবিরতা, শ্লথতা, অকারণ টেকনিক্যালিটি আর ফরমালিটির বৃত্তায়নে আকীর্ণ এই প্রশাসনিক কাঠামোর সমগ্র শরীর, উঁচুতলা থেকে নিচুতলা পর্যন্ত দীর্ঘসূত্রিতা ও সীমাহীন দুর্নীতিতে আক্রান্ত।

যেমন, প্রশাসনের ওপরে বসে আছেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ, আছেন কয়েক ডজন সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব, শাখা প্রধান ও তাদের বিশাল সংখ্যক কর্মচারীবৃন্দ। আছেন বিভিন্ন পরিদপ্তরের মহাপরিচালক, আছেন অনেক পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, আছেন প্রকৌশলীসহ বিরাট সংখ্যক কর্মচারীবৃন্দ। আছেন বিভিন্ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। আছেন প্রতিরক্ষা ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার বিরাট পদাধিধারী কর্মকর্তা ও তাদের অধীনস্থ বাহিনীর কর্মচারীবৃন্দ। প্রশাসনিক স্তরে আরো আছেন বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, এসডিও, সিও, তাদের কর্মচারীবৃন্দ, তারপর অ-নে-ক দূরে আছে জনসাধারণ। মাথাভারী প্রশাসনের এই হলো অবস্থা। নিচে সিও থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাঁক পেরিয়ে সচিবালয়ের সংরক্ষিত বিরাট অট্টালিকা পর্যন্ত এই দীর্ঘ প্রশাসনিক ছত্রের পাঁকে পাঁকে, টেবিলে টেবিলে, দেরাজে-আলমারীতে বিচারের বাণী গুমরে গুমরে কাঁদে এবং সেই সাথে প্রতিটি স্তরে স্তরে জড়িয়ে আছে বহুদিনের লালিত দুর্নীতির রোগ-

ব্যাধি। স্তূপীকৃত ফাইলের অন্ধকারে জমা হয়ে আছে বহু অবিচার, বহু অন্যায়, বহু হাহাকার, বহু দীর্ঘশ্বাস, বহু কান্না। লালফিতের গিঁটে গিঁটে দুর্নীতিনামক ব্যাধিটি বাসা বেঁধে আছে। 'ফাইলে মাল পানি খাইবার চায়', এই না হলে কোন ফাইল নড়ে না। মাল পানি না খাওয়াইলে এক কক্ষ থেকে অপর কক্ষে বা এক টেবিল থেকে অপর টেবিলে ফাইল পৌছতে একযুগও লাগে। কোন কোন ক্ষেত্রে ফাইল গায়েব হয়ে যায়। ফাইলের জরুরী গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র লা-পাত্তা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ফাইলবন্দী ব্যক্তির অবস্থা ।

আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরেকটি দিক হলোঃ ফাইলকে ফাইল, নোটকে নোট। বুলেট বোমা দিয়েও যেনো ফাইল নড়ানো যায় না। এমন একটি মাথাভারী, জগাখিঁচুড়ি, গতানুগতিক, নড়বড়ে, অথর্ব, আলসে, জৌলুসপূর্ণ ও গণবিরোধী প্রশাসন দিয়ে লক্ষ বছর চেষ্টা করলেও জনগণের সার্বিক কল্যাণ আসতে পারে না।

বঙ্গবন্ধু তাঁর অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি, জনগণের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার স্বাভাবিক কারণে আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের ফন্দিফিকির সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে, দুখী মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে নতুন করে প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাসে উদ্যোগী হলেন। বললেনঃ '......সেকশন অফিসার, তারপর ডেপুটি সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী, এডিশনাল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী, মন্ত্রী হয়ে তারপর আসে আমার কাছে। এসবের কোনো প্রয়োজন নাই। সোজাসুজি কাম চালান'। নতুন প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতি ইংগিত দিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেনঃ 'ইডেন বিল্ডিং (সেক্রেটারীয়েট) বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা রাখতে চাই না। আমি আস্তে আস্তে গ্রামে, থানায়, জেলা পর্যায়ে এটা পৌছে দিতে চাই, যাতে জনগণ সরাসরি তাদের সুযোগ-সুবিধা পায়। সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে জেলায় আমরা কানেকশন রাখতে চাই। তেমনি সরাসরি জেলার সঙ্গে থানার, থানার সঙ্গে গ্রামের কানেকশন রাখতে হবে। ষাটটি সাবডিভিশন হবে ষাটটি জেলা। প্রত্যেক জেলার জন্যে একজন গভর্নর থাকবেন। সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন, দলের প্রতিনিধিগণ থাকবেন, সংসদ সদস্যরা থাকবেন, সরকারী কর্মচারী থাকবেন। এদের নিয়ে একটি করে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল থাকবে, তার একজন গভর্ণর, তিনি স্থানীয়ভাবে শাসন ব্যবস্থা চালাবেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ডাইরেক্ট কন্ট্রোলে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট এ্যাড্মিনিস্ট্রেশন পরিচালনা করবে। শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ করা হবে।'

তিনি বললেনঃ 'এমপি আছে, নন এমপি আছে, সরকারী কর্মচারী আছে, আর্মি অফিসার আছে, কম্পিটিশন ভালো হবে।' বস্তুতঃ গ্রাম সমবায় হতে জেলা হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে একজন নিঃস্ব ব্যক্তি হতে শুরু করে যে কোনো পর্যায়ের লোক সুযোগ পাবে এবং কে কার থেকে বেশি

কর্মঠ, সৎ, দক্ষ তা প্রদর্শনের জন্যে প্রতিযোগিতায় নামবে। তাই প্রতিযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের বৃহত্তম অংশের প্রতিনিধিরা শাসন ক্ষমতায় নিজেদের আসন দখল করতে সক্ষম হবে। আর সুরক্ষিত সুসজ্জিত অট্টালিকা থেকে অফিসাররা তাদের দলবল নিয়ে অবহেলিত গ্রামবাংলার উদার উন্মুক্তপ্রান্তে, যেখানে বিদ্যুৎ নেই, গাড়ি নেই, এয়ারকন্ডিশনার নেই, টেলিভিশন নেই, নেই আরো অনেক কিছু, যার মধ্যে প্রকৃত বাঙ্গালী শ্রমজীবি মেহনতী মানুষ বসবাস করে, সেই গ্রামে নেমে আসতো জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হতে।

এ প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে বঙ্গবন্ধু বললেনঃ 'সরকারী কর্মচারী, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট আমরা সবাই জনগণের সেবক, মাস্টার নই। মেন্টালিটি আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। তাদের জন্যে কী করলাম, সেটাই আজ বড় প্রশ্ন।'

নতুন প্রশাসনের ভিত্তিভূমি রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। এই প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কার্যকর ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থা হিশেবে রূপ দিতে গিয়ে তিনি নির্বাহিক আর বিধানিক ক্ষমতার পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও অপ্রকাশ্য বিরুদ্ধতা দূর করলেন। তিনি বললেনঃ 'আর একটা বিষয় মার্ক করলাম। সেটা হলো এই যে, একদল বলে আমরা ব্যুরোক্রাট। তাদের এটিচিউড্ হলো, হাউ টু ডিসক্রেডিট দি পলিটিশিয়ান। পলিটিশিয়ানরা নিজেদের স্ট্রেংথ দেখাবার জন্যে বলতো যে, অলরাইট গেট আউট!'

নির্বাহিক আর বিধানিক ক্ষমতার মধ্যে এই মনোভাব সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার পক্ষে খুবই মারাত্মক। সে জন্যে তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সৎ ও যোগ্য সরকারি কর্মচারী এবং জনগণের আস্থাশীল পার্টিকর্মী সমন্বয়ে এই নতুন কাঠামো দাঁড় করলেন। এ ব্যবস্থার ফলে নির্বাহিক ও বিধানিক ক্ষমতার জটিলতার আবর্ত থেকে প্রশাসন মুক্ত হতো।

প্রচলিত শাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসক জনগণের কাছে কোনো প্রকারেই দায়ী নন। জনগণের মঙ্গল-অমঙ্গলের তোয়াক্কা না করে তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন। শুধু সেক্রেটারীয়েটের একজন উপসচিব বা যুগ্মসচিবকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই হলো। বঙ্গবন্ধু এই ব্যবস্থাকে বাতিল করে জেলা গভর্নর পদ সৃষ্টি করে তাকে জনগণের নিকট দায়ী করলেন। জেলা গভর্নররা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন বিধায় তিনি জনগণের নিকট দায়ী থাকবেন।

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত প্রশাসন ব্যবস্থার লক্ষ্যণীয় দিক হলো, ওপর থেকে নিচের দিকে চাপিয়ে দেয়া নয়। এখানে সর্বনিম্নস্তর থেকেই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উর্দ্ধতন প্রশাসন বা সরকার শুধুমাত্র নীতি নির্ধারণ, সমন্বয় সাধন, পর্যবেক্ষণ, অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগান ও তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থায়

কার্যসম্পাদনের দায়িত্ব থাকে আমলাদের ওপরে। মন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদ শুধুমাত্র নীতিনির্ধারণী অর্ডার লিখেই মুক্ত। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে কর্মের বিস্তৃত অঙ্গনে তাদের আদেশ কার্যকরভাবে ক্রিয়াশীল নয়; কেন না উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত এই প্রশাসনিক বিশাল আমলাবাহিনী শুধুমাত্র অগণতান্ত্রিকই নয়। এর উচ্চতর অংশ মতলববাজ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে অভিজ্ঞ, গণবিরোধী, ষ্টাইলিস্ট, বিদেশী শক্তির এজেন্ট এবং দুর্নীতির পঙ্কিলে নিমজ্জিত।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই গণবিরোধী প্রশাসনের ভয়াবহ অবস্থার কালো হাত থেকে পরিত্রাণ প্রয়াসে বঙ্গবন্ধু বললেন "আজকে আর্মি হোক, সিভিল এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন হোক, পলিটিশিয়ান হোক, বুদ্ধিজীবি হোক, যেখানেই হোক, ভালো লোক যেখানেই আছে তাদের বের করে কাজে লাগাতে হবে।—যাও ওখানে বসে কাজ করে নিয়ে আসো।'

প্রশাসন ব্যবস্থার এই ব্যাপক গণতন্ত্রায়নের অর্থ হলোঃ জনগণ নিজেই নিজেকে শাসন করবে, নিজের সমস্যা নিজেরা দেখবে, সমাধান করবে। তারাই তাদের শাসক ও ভাগ্যনিয়ন্তা, আমলারা নয়।

বস্তুতঃপক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত প্রশাসন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখি, গণতান্ত্রিক, বিকেন্দ্রিক ও আমলাতন্ত্র মুক্ত গণ-গ্রামমুখি, কার্যক্ষম ও দায়িত্বশীল এবং যৌথ প্রশাসন যা বাংলার অবহেলিত দুখী শোষিত মানুষের সার্বিক মুক্তির অন্যতম প্রধান সোপান।

খ. গণপ্রতিনিধিত্বশীল প্রশাসনঃ থানা প্রশাসনিক ও জেলা গভর্নর প্রকল্পঃ

পূর্বেই আমরা প্রচলিত গণবিরোধী প্রশাসন ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে মোটামুটি আলোচনা করেছি। ঐ প্রশাসনিক কাঠামোর বদৌলতে বৈদেশিক শক্তি তথা পুঁজিবাদী শক্তি ও দেশীয় ধনিকদের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা, প্রভাবপ্রতিপত্তি ও ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে যে প্রশাসনিক পূজারী, বাস্তবায়ক, ধারক ও বাহকগোষ্ঠী নিয়োজিত রয়েছে সেই গোষ্ঠীকে আমলাতান্ত্রিকগোষ্ঠী হিশেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১ ভাগও হবে না। মোট ৫% ভাগ ধনিকগোষ্ঠীর মধ্যেই এদের অবস্থান। ফলশ্রুতিতে ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থের সাথে এই ক্ষুদ্র আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর স্বার্থ এক হয়ে মিশে আছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, ধনিক ও আমলাতান্ত্রিকগোষ্ঠী, এই গোষ্ঠীদ্বয় একে অপরের স্বার্থের পরিপূরক শক্তি। এই ধনিকগোষ্ঠী আমলাতান্ত্রিকগোষ্ঠীর মাধ্যমে দেশের ৯৫% ভাগ জনগোষ্ঠীকে শাসন ও শোষণ করে চলেছে। প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থার সামগ্রীক চরিত্র ও গতিপ্রকৃতি এই লক্ষ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে। এই প্রশাসন উপনিবেশিক শাসন-শোষণের প্রশাসন।

স্বাধীন বাংলাদেশে উক্ত ব্যবস্থা চলতে পারে না। বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সার্বিক স্বার্থে তাই বঙ্গবন্ধু প্রচলিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে গণতান্ত্রিক বা গণপ্রতিনিধিত্বশীল প্রশাসন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন বাকশালের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে 'থানা প্রশাসনিক' ও 'জেলা গভর্নর প্রকল্পে'র কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রথমতঃ থানা প্রশাসনিক প্রকল্প

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর গ্রাম-সমবায়ের পরবর্তী ধাপ হিশেবে থানা প্রশাসনকে সাজানোর কথা বলা হয়েছে। বড়ো বড়ো থানাকে ছোটো ছোটো করে বাংলাদেশের প্রতিটি থানাকে কেন্দ্র করে যে প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করা হয়েছে, সেই প্রশাসন পরিচালনার জন্যে পার্টি ক্যাডার, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারী কর্মচারীদের রাখা হয়েছে। এখানে থানা প্রধানকে বলা হয়েছে 'থানা প্রশাসক' বা চেয়ারম্যান। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। তার অধীনে থাকবে 'থানা প্রশাসনিক কাউন্সিল'। এ কাউন্সিলের সদস্যরা বিভিন্ন গ্রাম সমবায়ের চেয়ারম্যান থেকে আসবেন। এই কাউন্সিলে জাতীয় দলের একজন সদস্য (যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন) থাকবেন। থানা সার্কেল অফিসার ও থানা পুলিশ কর্মকর্তাও থানা কাউন্সিলের সদস্য থাকবেন। থানা প্রশাসক/চেয়ারম্যান হবেন থানা প্রশাসনিক প্রধান। সার্কেল অফিসার ও পুলিশ কর্মকর্তা থানা প্রশাসকের অধীনে থাকবে। থানা পর্যায়ে সরকারের প্রতিটি দপ্তরের ওপর থানা প্রশাসকের ডাইরেক্ট কন্ট্রোল থাকবে—অর্থাৎ থানা প্রশাসনিক কাউন্সিলের অধীনে থানার সামগ্রীক প্রশাসন দায়ী থাকবে। সার্কেল অফিসার কাউন্সিলের সদস্য সচিব থাকবেন।

থানা প্রশাসনকে প্রধানতঃ তিনটি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ আইন শৃংখলা ও যাবতীয় উন্নয়ন; গ্রাম-সমবায়গুলোর তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন এবং থানা এলাকার যাবতীয় বিচারকার্যকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান। তবে থানার বিচার বিভাগ থানা প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকবে, থানা প্রশাসন বিচার বিভাগকে সাহায্য প্রদান করবে মাত্র।

থানা প্রশাসন যাবতীয় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সরাসরি জেলা প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবে। থানা এলাকার যাবতীয় উন্নয়ন, গ্রাম সমবায়সমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন, পরামর্শ দান, অর্থ যোগান ও হিসাব সংরক্ষণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুতায়ন, কুটির ও অন্যান্য শিল্পায়ন, আইন-শৃংখলা সংরক্ষণ ইত্যাদি কর্মকান্ডের দায়-দায়িত্ব সম্পাদনের ভার থানা প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

থানা প্রশাসনের এহেন উন্নয়ন ও ক্ষমতা প্রদানের স্বার্থে ইউনিয়ন ও মহকুমা

প্রশাসন ব্যবস্থাকে তুলে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ জেলা গভর্নর প্রকল্প

বাংলাদেশের প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে 'জেলা প্রশাসনিক' বা 'জেলা গভর্নর প্রকল্পে'র কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। মহকুমাগুলো জেলায় রূপান্তরিত হওয়ার ফলে নতুন জেলাগুলোর আয়তন অনেক কমে গিয়েছে। এর ফলে এক দিকে যেমন জেলাকে গ্রামের কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়েছে, তেমনি জেলার প্রভাবে বিভিন্ন এলাকায় দ্রুত ব্যবসা-বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও ছোট ছোট নগর-বন্দর-গঞ্জ গড়ে উঠবে। এ ব্যতীত জেলাসদর শহর দ্রুত সম্প্রসারিত হয়ে পড়বে বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আয়তন বেড়ে যাওয়ার ফলে। এ ছাড়া শহরের আশপাশে দ্রুত বিভিন্ন ছোটো বড়ো শিল্পকলকারখানা ও কুটির শিল্প সংস্থাসমূহ গড়ে উঠবে, ফলে বেকার সমস্যার সমাধান ক্রমান্বয়ে অনেকখানি সম্ভব হতে থাকবে। এ ব্যতীত গ্রামীণ শহরমুখি ব্যক্তিরা জেলাসদরে তাদের বাসাবাড়ি তৈরি করার ফলে দ্রুতই জেলার জৌলুস ও চেহারার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। অপরদিকে থানা ও গ্রাম সমবায়গুলোর সাথে জেলার দূরত্ব কমে আসবে এবং সার্বিক যোগাযোগ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দ্রুত গড়ে উঠতে থাকবে। এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

থানা প্রশাসনিক কাউন্সিলের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি, জাতীয় দলের প্রেরিত সদস্য ও সরকারী কর্মচারীদের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে জেলা প্রশাসনিক কাউন্সিল। জেলা প্রশাসনিক কাউন্সিলের প্রধানের পদবী হবে 'জেলা গভর্নর'। জেলা গভর্নর জেলার সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। বর্তমান জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জেলা গর্ভণরের অধীনে থাকবেন। বর্তমান জেলা প্রশাসক, সামরিক কর্তকর্তা ও পুলিশ সুপার পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসনিক কাউন্সিলের সদস্য থাকবেন। জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসনিক কাউন্সিলের সদস্য থাকবেন।

জেলার যাবতীয় উন্নয়ন, থানা ও গ্রাম সমবায়সমূহের তত্ত্বাবধান, সমন্বয়, পরামর্শদান, অর্থ যোগান ও হিসাব সংরক্ষণ, সরকারী বা রাজনৈতিক বিষয়াবলীর বাস্তবায়ন, জাতীয় সরকারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ, গ্রাম সমবায়সমূহ ও থানাগুলোর মধ্যকার যাবতীয় বিরোধ ও সমস্যার সমাধান, আইন-শৃংখলার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন, জেলা স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং বিচার বিভাগকে বিভিন্নভাবে সহায়তাদান ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পাদনার দায়-দায়িত্ব

জেলা প্রশাসনিক কাউন্সিলের এখতিয়ারে থাকবে।

সরকার শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সংসদ সদস্যদের জন্যে থানা ও জেলা প্রশাসনিক কাউন্সিল প্রয়োজনীয় সদস্য পদ সৃষ্টি করবেন। সংসদ সদস্যদের পদমর্যাদা উপমন্ত্রী এবং সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহের সচিবদের ওপরে থাকবে বিধায় সংসদ সদস্যরা থানা-জেলা প্রশাসনিক কাউন্সিল ও মন্ত্রণালয়ের ওপর তাদের তদারকী ক্ষমতা রাখতে পারবেন। জেলা গভর্নররা প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা ভোগ করবেন। এ বিষয়ে শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সংযোজনের ব্যবস্থা রাখা হতো।

থানা প্রশাসনিক ও জেলা গভর্নর বা জেলা প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে কী কী সুফল পাওয়া যেতো তদ্বিষয়ে পরবর্তীতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত গণমুখি বিচার ব্যবস্থার রূপরেখা

প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে কবি খেদোক্তি করে বলেছেনঃ 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। বস্তুতঃপক্ষে বর্তমান বিচার পদ্ধতিতে বিচারের বাণী ও প্রার্থীর দীর্ঘশ্বাস আদালতের কঠিন ইটের সাথে ধাক্কা খেয়ে গুমরে গুমরে কাঁদে। অবশেষে অসহায় ও দরিদ্র বিচার প্রার্থীর প্রাণ বায়ু শূন্যে মিলিয়ে যায়, তাতে আদালত বা আইনকানুনের কিছুই যায় আসে না।

প্রচলিত বিচার পদ্ধতির সরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেনঃ 'বাংলাদেশের বিচার ইংরেজ আমলের বিচার। আল্লাহর মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস্ পড়ে, সেই মামলা শেষ হতে লাগে বিশ বছর। আমি যদি উকিল হই, আমার জামাইকে উকিল বানিয়ে সেই কেস্ দিয়ে যাই। ঐ মামলা ফয়সালা হয় না। আর যদি ক্রিমিনাল কেস্ হয়, তিন বছরের আগে তা শেষ হয় না। এই বিচার ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়তে হবে। থানায় ট্রাইবুনাল করার চেষ্টা করছি। সেখানে মানুষ যাতে ন্যুনতম সময়ের মধ্যে বিচার পায়, তার বন্দোবস্ত করছি।'

বঙ্গবন্ধু গ্রামীন অর্থনৈতিক তথা সামগ্রীক আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথে প্রচলিত অবিচারমূলক বিচার ব্যবস্থার জটকে ভেঙ্গে দিয়ে একে গণমুখি, সহজলব্ধ এবং ত্বরিৎ গতিসম্পন্ন করার বৈপ্লবিক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। বিচার ব্যবস্থাকে তিনি এমনভাবে ঢেলে সাজাবার প্রয়াসী হলেন যাতে সাধারণ নিরীহ মানুষ হাতের কাছে ত্বরিৎগতিতে ন্যায় বিচার পায় এবং বিচার প্রার্থনা সহজলভ্য হয়ে ওঠে।

বলাই বাহুল্য, প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘসূত্রিতায় আকীর্ণ ও হয়রানিমূলক। বর্তমান সমাজ সভ্যতার প্রবহমান কাঠামোসৃষ্ট উদ্ভুত পরিস্থিতির সুযোগে গ্রামবাংলার নিরীহ মানুষকে বিচারের নামে বছরের পর বছর হয়রানি হতে হয়। তাকে উকিল ঠকায়, উকিলের মোহরী ঠকায়, গ্রামের মতলববাজ-মামলাবাজ-টাউটরা ঠকায়, পেশকার ঠকায়, কোর্ট দারোগা ঠকায়, কেরাণী ঠকায় তথা এই পেশার সকলে মিলে ঠকায়, প্রতারণা করে, শোষণ করে। শোষণ দুর্নীতি ও ঘুষের দুষ্টগ্রহ চারপাশ থেকে তাকে অক্টোপাসের মতো বেঁধে ফেলে। বিচার প্রার্থনা করতে এসে অবশেষে এভাবে হয় সে সর্বশান্ত সর্বহারা; ঘরবাড়ি জমাজমি সবকিছু তাকে বিক্রি করতে হয়। পরিনামে সে অকালে ঝরে পড়ে পৃথিবী থেকে। বিচারের নামে অবিচার ও প্রহসনের দুর্বোধ্য-দুর্লংঘনীয় ফাঁদ থেকে তাকে মুক্তি পেতে হলে

ভেঙ্গে ফেলতে হবে দুর্নীতিমূলক, অবিচারমূলক, অথর্ব, নড়বড়ে, পংকিলতায় নিমজ্জিত, লোকঠকানো, লোক দেখানো ও শোষণের খোঁয়াড় এই বিচার ব্যবস্থাকে। 'ঘুষের আঁড়ত,' 'ভূতের আড্ডা', ও 'দুষ্টের আড্ডা' হতে বিচারকদের মুক্ত করে নিয়ে আসতে হবে গ্রামের অবারিত প্রান্তরে, মাটির মানুষের কাছে। এ জন্যে বঙ্গবন্ধু বললেনঃ 'গ্রামবাংলার মানুষ যাতে সুবিচার পায় তার জন্যে বিচার ব্যবস্থাকে তাদের নাগালের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।'

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বিচারের মানদন্ড হলো অর্থ; আইন কানুন নয়। যিনি বিত্তবান তিনি অর্থের জোরে বড় বড় ব্যারিষ্টার উকিল রাখতে পারেন। এ সমাজে অর্থ, রাজনৈতিক-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে বিচারককে প্রভাবিত করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারককেও প্রভাবিত করা যায়। বিচারক যদি বাইরের প্রভাবকে এড়িয়ে যান বা কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তির কথা না শোনেন তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে সেই বিচারককে হয়রানি হতে হয় বা চাকরি থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। এর বহু নজীর এ সমাজে রয়েছে।

নিরীহ মানুষের পক্ষে কোনোভাবেই বিচারকে প্রভাবিত করা সম্ভব হয় না ফলে সুবিচারের সুযোগ হতে সে হয় বঞ্চিত। এ ব্যতীত সুদূর প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে সুদূর মহকুমা, জেলা বা রাজধানীতে গিয়ে জজকোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে এসে বিপুল অর্থের শ্রাদ্ধ করা তাদের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। সেই কারণে গ্রামের বিচার গ্রামে বা থানায় করার মহান লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে প্রয়াসী হলেন। সেখানে বিচার থাকবে হাতের নাগালের মধ্যে। অর্থ ও কোনো প্রকার ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে বিচার ও বিচারককে প্রভাবিত করার সুযোগ থাকবে না। বিচারকার্যে দীর্ঘসূত্রিতা ও শ্লথতার কোনো অবকাশ থাকবে না। টাউট-বাটপাড় পেশকার কেরানীদের দৌরাত্ম্য থাকবে না।

প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় বিচারকদের বিব্রত ও চাকরি হারানোর ভয় থাকে। এর কারণ এই যে, বর্তমান বিচার ব্যবস্থা প্রশাসনের কব্জায়। আদালতে যিনি বিচারক, তিনিই আবার নির্বাহী প্রশাসক। এ এক অদ্ভুত, কিংভূতকিমাকার, জগাখিচুড়ি ও গোঁজামিলের বিচার পদ্ধতি। নির্বাহী প্রশাসক মূলতঃ রাজনৈতিক বা ক্ষমতাসীন পার্টির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তিনি রাজনৈতিক সরকারের নিদের্শন পালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ, তিনিই যখন আবার বিচারক তখন বিচার নিরপেক্ষ হতে পারে না। ফলে বিচার হয়ে থাকে একতরফা, একদেশদর্শী ও পক্ষপাত দুষ্ঠ। এ জাতীয় বিচার প্রসহসনমূলক বৈ কিছু নয় যা অবিচারেরই নামান্তর।

সেই জন্যে বঙ্গবন্ধু বললেনঃ 'বিচার বিভাগ হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন'। বিচার ব্যবস্থাকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ,, প্রশাসন ও রাজনীতিমুক্ত রাখার জন্যে বঙ্গবন্ধু

আমাদের জাতীয় শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির ২২ নং ধারায় বলে দিলেনঃ "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।' এ প্রসঙ্গে বাকশাল গঠনতন্ত্রের (১০) উপধারায় বলা হয়েছে "কোন সরকারি, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, আইনবলে গঠিত সংস্থা ও করপোরেশন প্রভৃতির কর্মচারি সদস্যপদপ্রার্থী হইলে তাকে পূর্ণ সদস্যপদ কিংবা প্রার্থী সদস্যপদ দানের ক্ষমতা জাতীয় দলের চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত থাকবে, তবে আদালতে বিচারকার্যে নিযুক্ত কোনো .কর্মচারী বা বিচারক আদৌ জাতীয় দলের সদস্য পদ প্রার্থী হইতে পারিবে না।"

৭ই আগষ্ঠ, ১৯৭৫ সাল। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বললেনঃ 'বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্টকে রাজধানীতে বহাল রেখে হাইকোর্ট ডিভিশনকে ৮টি আঞ্চলিক বিভাগে বিকেন্দ্রিকরণের ব্যবস্থা নিয়েছি। তবে সুপ্রিম কোর্টের অধিবেশন বছরে অন্ততঃপক্ষে একবার করে প্রতিটি (বিচার বিভাগীয়) আঞ্চলিক বিভাগে বসবে। জেলা আদালতসমূহ বহাল থাকবে। থানাতে থাকবে 'বিশেষ থানা ট্রাইবুনাল'। গ্রাম পর্যায়ে থাকবে 'শালিস বোর্ড'। শালিস বোর্ড গঠিত হবে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি সমন্বয়ে। সরকার কতৃক শালিস বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবেন। তবে শালিস বোর্ড থানা প্রশাসনের এখতিয়ারে থাকবে।'

এইভাবে সুষ্ঠ গতিশীল নিরপেক্ষ স্বাধীন দ্রুতগতিসম্পন্ন ও বিকেন্দ্রিক বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারকে নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যেই প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাকে বিপুলভাবে সংস্কার করার কর্মসূচী নেয়া হয়েছিল। ' দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'—এ মহান লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রচলিত বিচার বিভাগকে পুনর্গঠিত করে বিচারপ্রাপ্তিতে সহজলভ্যতা, ত্বরিৎগতিসম্পন্ন, পুরোপুরি গণমুখি, প্রগতিশীল এবং স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার যাবতীয় কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন।

‘দ্বিতীয় বিপ্লব’ বা বাকশাল ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে কী ফলাফল পাওয়া যেতো

বঙ্গবন্ধুর ‘দ্বিতীয় বিপ্লব’ তথা তাঁর প্রবর্তিত ‘বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ’ বা বাকশাল-এর রাজনৈতিক আর্থসামাজিক প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই ঘাতকের দল বঙ্গবন্ধু ও তাঁর বিশিষ্ট অনুসারীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নের মূল শক্তিই ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়েই বাকশাল ব্যবস্থা তথা দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির বাস্তবায়ন স্থগিত হয়ে যায়। ফলে ব্যাপক সাধারণ জনগণ একদিকে যেমন বাকশাল সম্পর্কে পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল হতে পারেনি, তেমনি বাকশাল কর্মসূচীর বাস্তবায়নের ফলাফলও তারা প্রত্যক্ষ করতে পারেনি। উপরন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট-পুঁজিবাদের প্রবক্তা-গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারসমূহ ও তাদের রাজনৈতিক দালাল গোষ্ঠীর নেতৃত্বের ৫ ডজন রাজনৈতিক দল একযোগে আদাজল খেয়ে বাকশাল বিরোধী গোয়েবলসীয় প্রচারণায় লিপ্ত রয়েছে। দীর্ঘকাল রাজনীতিকে সামরিক ছাউনিতে বন্দী করে ঐ সব সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহ একতরফাভাবে বাকশালের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বিষবাণ বর্ষণ করে বেশ ফল লাভ করেছে, ফলশ্রুতিতে সাধারণ জনগণ বঙ্গবন্ধুর ‘দ্বিতীয় বিপ্লব” তথা বাকশাল ব্যবস্থা সম্পর্কে বিপুলভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে।

অপরদিকে বাকশালকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের নানান বিভক্তি ও মূল আওয়ামী লীগের বাকশাল সম্পর্কে কার্যকরি প্রচারণার অভাব, সীমাহীন নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি কারণে সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা বা বিভ্রান্তি দূর হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ঠ থেকে শুরু করে প্রায় সাড়ে তিন বছর নিশ্চুপ থাকার পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বাকশাল সম্পর্কে সর্ব প্রথম মুখ খুললেন। কিন্তু ততোদিনে যা হবার তা-ই হয়ে গেলো। অপরদিকে বাকশাল সংগঠন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অঙ্গনে অনুপস্থিত থাকার ফলে জনসাধারণ আরো অতিমাত্রায় বিভ্রান্ত হয়েছে। কারণ বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগই বাকশালের গোড়াপত্তন করেছিলেন। সেই আওয়ামী লীগই যখন বাকশাল সংগঠনের বাইরে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত হলো তখন সাধারণ মানুষ বাকশাল সম্পর্কে বিভ্রান্ত হবে, সন্দেহ পোষণ করবে, এটাই তো

স্বাভাবিক। জনসাধারণের এই বিভ্রান্তি ও ভ্রান্তধারণার সুযোগ বিরুদ্ধবাদীরা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। একদিকে আওয়ামী লীগের বাকশাল পাশ কেটে যাওয়া, অপরদিকে বিরোধীচক্রের সীমাহীন অপপ্রচার—এমনি অবস্থায় জনসাধারণ বাকশাল সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা পোষণ করলে তাদেরকে তো আর দায়ী করা চলে না। যারা একদা স্বেচ্ছায় বাকশালে যোগদান করেছিলেন তারাই যখন বাকশালকে গালমন্দ করেন, আর আওয়ামী লীগ যখন বাকশাল পাশ কেটে পুনরুজ্জীবিত হয় এবং ঐ সব সুবিধাবাদীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণে বেদনাদায়কভাবে ব্যর্থ হয় তখন জনসাধারণ যদি বাকশাল গ্রহণ না করেন তখন এর জন্যে মূলতঃ দায়ী কারা?

আবার আওয়ামী লীগ সবসময় বলে আসছে যে তারা যদি আবার ক্ষমতাসীন হতে পারেন তাহলে তারা শুধু বাকশালের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করবেন। এটাও একটা বিভ্রান্তিকর বিষয়। বাকশাল বা 'দ্বিতীয় বিপ্লব' ছিলো একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার একটি প্লাটফরম। এর রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও প্রশাসনিক কর্মসূচী একে অপরের পরিপূরক। কারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থাই আর্থসামাজিক প্রশাসনিক কাঠামোর গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে থাকে। এটাই সকল রাজনৈতিক দর্শনের মূল কথা। রাজনৈতিক ব্যবস্থাই এখানে মুখ্যভূমিকা পালন করে থাকে। রাজনীতি এখানে মাথা, অর্থনীতি হলো দেহ, প্রশাসন হলো পা। আর বিচার ব্যবস্থা হলো পরিবেশ ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি। মাথা-দেহ, পা নিয়ে যেমন একটা জীবন—তদ্রুপ রাজনীতি অর্থনীতি ও প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য নিয়েও বাকশাল। একটিকে বাদ দিলে অপরটি বা অন্যটি অর্থহীন। বা একটির অভাবে অন্যান্যটি অসম্পূর্ণ। তবে মাথা না থাকলে যেমন কোনো জীব জীবন্ত নয়—তেমনি বাকশালের মাথা রাজনৈতিক ব্যবস্থা ব্যতীত অন্যান্যটি জীবন্ত নয়। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সার্বিক পূর্ণাঙ্গতা প্রতিফলিত হয়েছে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' তথা বাকশাল ব্যবস্থার মধ্যে। বঙ্গবন্ধু যদি রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকেন তাহলে খন্ডিতভাবে নয়—পূর্ণাঙ্গ বঙ্গবন্ধুকে ধরে রাখতে হবে। আর পূর্ণাঙ্গ বঙ্গবন্ধু মানেই বাকশাল। এ কথাটাই সকলকে স্মরণ রাখতে হবে।

আরেকটি কথা। বিরুদ্ধবাদীমহল বললো ঃ বাকশাল ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র বিরোধী একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা। অমনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব নিজেদের দৈন্যতা প্রকাশ করে বললেনঃ বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ শোষণহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবো। তাঁরা বিরুদ্ধবাদীমহল ও জনগণকে বুঝাতে পারলেন না যে, বাকশাল সর্বশ্রেণী সর্বস্তরের ও সর্বদলীয় একক

জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন; বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ-সমৃদ্ধি ও তাদের প্রকৃত শাসন যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অর্জিত ও প্রতিফলিত হয় তার নামই গণতন্ত্র।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বুঝাতে পারলেন না যে, দুনিয়ার কোন ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না যে বহুদলীয় তথাকথিত গণতন্ত্র বা প্রচলিত আর্থব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জনগণের কোনো কল্যাণ সাধিত হয়। ব্যাপক সাধারণের কোন কল্যাণ হয় না বলেই ইসলামের সাম্যবাদী ব্যবস্থায় একক জাতীয় দলের সন্ধান পাওয়া যায় যাকে 'খেলাফতে রাশেদীন' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বর্তমান মার্কসীয় সাম্যবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি দিলেও এর প্রমান মেলে। ঐ সব রাষ্ট্রে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রাজনৈতিক দলের আদর্শভিত্তিক আর্থবৈষয়িক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক কর্মসূচীর একটি পরিপূরক ব্যবস্থা ব্যতীত সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং সাম্যবাদী ব্যবস্থায় গোঁজামিল বা এর আদর্শের ব্যাপারে কোনো কিছু রেখে ঢেকে পাশ কেটে যাওয়ার অর্থই বুর্জোয়াতন্ত্রের শামিল।

প্রচলিত পশ্চিমী দুনিয়ার পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সংসদীয় বা বুর্জোয়া স্বার্থভিত্তিক গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র পাশাপাশি চলতে পারে না। সুতরাং আওয়ামী লীগের উচিত জনগণকে বাকশাল গঠনের ঐতিহাসিক দার্শনিক ও সমাজব্যবস্থার বাস্তব প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেয়া। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে তথাকথিত বহুদলীয় গণতন্ত্রের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট যে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার দেউলিয়াত্বে জনগণ নিপতিত হয়েছে, তাতে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, প্রচলিত বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থায় জনগণের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত ও নিরাপদ নয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা বাকশাল ব্যবস্থাই সব অসংগতি অব্যবস্থা দুর্নীতি শোষণ ও বৈষম্যের কার্যকরি ও স্থায়ী সমাধান দিতে সক্ষম।

প্রস্তাবিত বাকশাল ব্যবস্থার রাজনৈতিক আর্থসামাজিক ও প্রশাসনিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে কী ফলাফল পাওয়া যেতো, এটা বড়োই কঠিন প্রশ্ন। কারণ ভ্রূণ অবস্থায় যে শিশু মারা যায়, সেই শিশু ভূমিষ্ট হয়ে জীবনে বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে সে কী হতে পারে, এই প্রশ্ন ও ঐ প্রশ্ন একই পর্যায়ে পড়ে। তবে যেহেতু বাকশাল ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী নেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কতিপয় বাস্তব পদক্ষেপও নেয়া হয়েছিলো, তারই আলোকে আমরা এর ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করতে পারি।

প্রথমেই আমরা বাকশালের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছি। বাকশাল গঠনের ঐতিহাসিক দার্শনিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপট বিষয়ে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। কেন এবং কি কারণে বঙ্গবন্ধু বাকশাল নামক একক জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং বাকশাল কী এবং কেনো, সে সম্পর্কে বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকা একটি সুস্পষ্ট ধারণা নিতে পেরেছেন বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

বাকশালের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে আদি ও অকৃত্রিম গণতান্ত্রিক শাসন বা বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত বঞ্চিত অবহেলিত দুখী মেহনতী শ্রমজীবি বাঙ্গালীর প্রকৃত 'গণ-একনায়কতান্ত্রিক' শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত হতো। এ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচারভিত্তিক ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যক্তিক্ষমতা ব্যক্তি প্রভাব-প্রতিপত্তি, মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের মুক্ত-অবাধও একচেটিয়া রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতো। ফলে সমষ্ঠিগত মঙ্গলভিত্তিক ভাগ্যোন্নয়নের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হতো এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় ব্যাপক প্রক্রিয়ায় গ্রামসমবায়, পরিষদ, থানা প্রশাসনিক পরিষদ, জেলা প্রশাসনিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদে ঐ বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিরা অনায়াসেই এসে যেতো এবং তারা তাদের শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়নের স্বার্থে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে সর্বপ্রকার অধিকার আদায় করে নিতে পারতো।

জাতীয়ভিত্তিক একক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আর্থবৈষয়িক ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত সাম্যতার ফলে ব্যাপক জনগণের মধ্যে একতা, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা, পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহনশীলতা, সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হতো। ব্যাপক জনগণের এ জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাবার সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিবিপ্লবীচক্র ও শোষকগোষ্ঠীর কোনো ষড়যন্ত্র কার্যকর হতে পারতো না। কারণ এ ব্যবস্থায় জনসাধারণ তাদের স্বার্থ সম্পর্কে পূর্ণভাবে সজাগ হয়ে যেতো এবং তাদের স্বার্থবিরোধী কোন তৎপরতা ও ষড়যন্ত্র হালে পানিই পেত না। একবার এ রাজনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে কোন উচ্চাভিলাষী স্বার্থবাদীচক্রের সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতা দখলের কোন প্রচেষ্টা কার্যকর হতো না, যেমন কোনো সমাজতান্ত্রিক বা প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আজ পর্যন্ত কোনো সামরিক অভ্যুত্থান হয়নি! কারণ এই ব্যবস্থায় আনসার, পুলিশ, রক্ষী ও সশস্ত্র বাহিনীকে (জরুরী ও যুদ্ধকালীন অবস্থা ব্যতীত) প্রতিটি জেলায় ও গভর্নরদের নিয়ন্ত্রণে বিকেন্দ্রিকরণ করা হতো। তবে তাদের 'চেইন অব কমান্ড' অক্ষুণ্নই থেকে যেতো। জেলা প্রশাসনিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণে গ্রাম-সমবায় ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক

কাজ ও থানা জেলার সার্বিক আইন-শৃংখলা তদারকী কার্যক্রমে তাদের নিয়োজিত রাখা হতো। ফলে জনসাধারণ তাদের সংস্পর্শে এসে শৃংখলাবোধী জীবন পেতো, জনগণের সাথে তাদের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতো এবং জনগণ তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে পারতো। ফলে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, প্রতিবিপ্লবী কার্যক্রম ও বহিঃশত্রুর আক্রমণকে একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হতো। অর্থাৎ দেশের তাবৎ জনগণ সামরিক বাহিনীতে পরিণত হতো এবং সামরিক বাহিনী জনগণের বাহিনী বা গণবাহিনীতে পরিণত হতো।

এ ব্যতীত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাম্যবাদী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযুক্ত সদস্যদের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করা হতো। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যকে বাকশালের কার্যনির্বাহী পরিষদ ও জেলা গভর্নর পদে রাখা হয়েছিলো এবং তেমনিভাবে বেসামরিক প্রশাসনেও তাদের রাখা হয়েছিলো। জনগণের মতো তারাও পূর্ণভাবে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভে সক্ষম হতো। ফলে কোন ব্যক্তি শক্তি বা গোষ্ঠী উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করার সুযোগ পেতো না। সামরিক বাহিনী যেহেতু একই জাতীয় দল ও জনগণের বাহিনী, সেক্ষেত্রে পার্টি, জনগণ ও তাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন থাকায় তারা কোন হঠকারী প্রতিবিপ্লবী শক্তি শোষক ও বিদেশীশক্তির ক্রিড়নকের ভূমিকায় অবর্তীর্ণ হতে পারতো না, আর কোন উচ্চাভিলাষী সামরিক জান্তা এ জাতীয় কোন গণবিরোধী ও অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়লে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিরোধের দাবানল জ্বলে উঠতো।

বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের জনগণের এই সমষ্টিগত মঙ্গলভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলে ব্যাপক জনগণের মধ্যে যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ হতো, তাতে আমাদের জাতীয়তাবোধ বা জাতীয়তাবাদ জাগ্রত সুসংহত ও বলিষ্ঠ হতো। এ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু হলে প্রচলিত অবাধ মুক্ত একচোটিয়া প্রতিযোগিতা ও স্বেচ্ছাচারমূলক কোটারীভূক্ত রাজনীতির কবর হয়ে যেতো; প্রচলিত রাজনীতিতে সৃষ্ট প্রতিযোগিতা ও শোষণবাদী আর্থবৈষয়িক প্রেক্ষাপটে 'ধনী আরো ধনী ও গরীব আরো গরীবে' পরিণত হতো না।

১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে অবাধ ও মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে বিগত মাত্র ক'বছরের মধ্যে বালাদেশে ৫ ডজন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়েছে এবং মাত্র ২ জন কোটিপতির স্থলে কয়েক শতাধিক কোটিপতি পরিবারের

আবির্ভাব ঘটেছে। অপরদিকে মেহনতী শ্রমজীবি কৃষক-শ্রমিক সাধারণ জনগণ তথা ৯৫% ভাগ মানুষ এই রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার দাবাখেলায় নানান অনৈক্য ও বিশৃংখলার আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং সীমাহীন অভাব, দারিদ্র্যতা, রোগ—শোকে, অশিক্ষায়—কুশিক্ষায় ও কুসংস্কারের তিমিরে নিপতিত হয়ে ধুকে ধুকে মরছে। এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না যদি বাকশালের রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকতো। কারণ এর রাজনীতিতে সৃষ্ট আর্থবৈষয়িক ব্যবস্থায় অবাধ ও মুক্ত ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্কুচিত করে রাষ্ট্রীয় বা জনগণের সমষ্টিগত মালিকানা ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে সংহত ও কার্যকর করা হতো। ফলে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা ও ব্যক্তিসম্পদের পাহাড় জমতে পারতো না এবং ব্যাপক জনগণের জীবনে এহেন সীমাহীন নির্মম দুর্গতি উদ্ভবের কোনোই অবকাশ থাকতো না।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বলতে বুঝায় গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি! কারণ এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ জনসাধারণ গ্রামেই বসবাস করে। এর মধ্যে ৮৫% ভাগই প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকাজের সাথে জড়িত। আর মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬৫% ভাগই আসে গ্রামীণ অর্থনীতি তথা কৃষি অর্থনীতি থেকে। আর এই গ্রামীণ অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকল্পে বাকশাল আর্থব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

প্রচলিত আধাসামন্তবাদী শোষণভিত্তিক ভূমিব্যবস্থার আমূল বিবর্তনের ওপরই নির্ভর করে সমৃদ্ধশালী অর্থনীতির সোপান। আধাসামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থায় বাংলার বুকে সৃষ্টি হয়েছে জোতদার ও বৃহৎ ভুস্বামী পরিবার। মোট কৃষকের মধ্যে এদের সংখ্যা মাত্র ৮% ভাগ। এদের হাতেই রয়েছে মোট কৃষিজমির ৭৭% ভাগ। এরা জমিতে কোনো প্রকার শ্রম প্রদান করে না। এদের অধিকাংশই শহরে অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত, শহরেই এরা বসবাস করছে। তবে এরা শহর-বন্দর ও গঞ্জের বৃহৎ মাঝারি ও ছোটো ছোটো শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে নিজেদের তহবিলে অর্থ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে। গ্রামে বসবাস করে বৃহৎ কৃষকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষক-মজদুররা। ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের অল্প সংখ্যক ঐ সব বৃহৎ ও জোতদার পরিবারের জমি বর্গায় চাষাবাদ করে ও অন্যান্য কৃষকদের জমিতে মজুরী খাটে। মান্ধাত্মামলের চাষবাস, সময় মতো কৃষিসরঞ্জাম না পাওয়ায় বা টাকার অভাবে তা সংগ্রহ করতে না পারায়, এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা প্রভৃতি কারণে ক্রমেই জমির উৎপাদন কমে যায়। ফলে ক্ষুদে কৃষক, বর্গাদার ও ভূমিহীনদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। ক্ষুদ্রে কৃষকরা বাধ্য হয়ে

জমি বিক্রি করে সংসার চালায়। এভাবে তারাও প্রতিবছর ভূমিহীন কৃষক, বর্গাদার ও ভূমিহীনদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ছে। ক্ষুদে কৃষকরা বাধ্য হয়ে জমি বিক্রি করে সংসার চালায়। এভাবে তারাও প্রতিবছর ভূমিহীন কৃষকের কাতারে শামিল হচ্ছে। ভূমিহীন কৃষক-মজদুরদের অবস্থা তো কল্পনাও করা যায় না। এ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদে কৃষকদের জমি চলে যাচ্ছে ধনিক জোতদারগোষ্ঠীর হাতে। মাঝারি কৃষকদের অবস্থাও তথৈবচ। তারাও পর্যায়ক্রমে ক্ষুদে কৃষকে পরিণত হয়ে অবশেষে ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে। এই আধাসামন্তবাদ ভূমি ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে বাংলার কৃষকদের শতকরা ৬৫ ভাগ ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থা অব্যাহতভাবে চলতে থাকলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে দেশের সকল কৃষিজমি শতকরা ১০%-১৫% ভাগ্যবান জোতদার ধনিকদের মালিকানায় চলে যাবে। আবার বাংলার বুকে প্রতিষ্ঠিত হবে কুখ্যাত সামন্তবাদী বা জমিদারী প্রথা। কিন্তু এটি আর হতে দেয়া যায় না। আধাসামন্তবাদী ব্যবস্থাকে এক্ষণেই আমূল সংস্কারের জন্যে এবং উৎপাদন ও বন্টন নীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেয়া আশু প্রয়োজন যাতে বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র দুখী গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জিত হয়। এ লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রণীত হলো 'বাধ্যতামূলক বহুমুখি গ্রাম-সমবায় প্রকল্প'।

গ্রাম-সমবায় প্রকল্প চালু হলে সমবায় এলাকার সকল কৃষিজমি সমবায়ের ওপর ন্যস্ত হতো। সমবায় এলাকার সকল সাবালক কৃষক-কৃষানী সমবায়ের সদস্য হতে পারতো এবং সকলে মিলে চাষাবাদ করতো। এ পদ্ধতিতে বর্গা প্রথা, মজদুর প্রথা উঠে যেতো। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমপ্রদানের জন্যে সকলকে একদিকে যেমন পারিশ্রমিক দেয়া হতো, অপরদিকে উৎপাদিত ফসল জমির মালিকবৃন্দ, কৃষিশ্রমিক বা ভূমিহীন ও সমবায় বা সরকারের মধ্যে সমান তিনভাবে ভাগ করা হতো। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনের বিপ্লব শুরু হলে ব্যাপক দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হতো এবং ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে রফতানী করে কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানী করে দেশকে শিল্পায়িত করা সহজতর হতো। অপরদিকে বিধিবদ্ধ পুঁজিতে বেসরকারী উদ্যোগে বা ব্যক্তিমালিকানায় ছোটো ছোটো শিল্পকলকারখানা প্রতিষ্ঠা ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহ প্রদান করা হতো। তবে ব্যক্তি মালিকানা যাতে তাদের শ্রমিকবৃন্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রেতা সাধারণকে শোষণ করতে না পারে তজ্জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। আর সরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠতো বৃহৎ বৃহৎ শিল্প কলকারখানা, কুটির শিল্প, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় বা বৈদেশিক নানা ব্যবসা-বাণিজ্যিক

প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান। তবে সরকার পূর্বাহ্নেই দেশের বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, পরিত্যক্ত শিল্প কলকারখানা, ব্যাংক বীমা, যোগাযোগ, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যেকে জাতীয়করণ করেছিলেন। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মতো শিল্পোৎপাদন, বাণিজ্যিক উৎপাদন ও অন্যান্য সকল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ ও তাদের ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক ও লভ্যাংশ প্রদানের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা থাকতো। এ থেকে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মচারীরা বঞ্চিত হতো না, তারাও যুক্তিসঙ্গত পারিশ্রমিক ও বোনাস পেতো।

এভাবেই বাংলাদেশে একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার কর্মসূচী ও প্রকল্প বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত হয়েছিলো তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লব' তথা বাকশালের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে। এর ফলশ্রুতিতে শোষক-শোষিত, বৃহৎ ধনিক-সর্বহারার কোনো অবকাশ সৃষ্টি হতো না।

বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত প্রশাসনিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে গ্রামসমবায়ই হতো প্রশাসনের প্রাথমিক ও মূল ভিত্তি। এরপরেই থানা ও জেলা প্রশাসনিক স্তর গড়ে উঠতো। তারপরেই থাকতো জাতীয় সরকার। এ ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ, মহকুমা ও বিভাগীয় প্রশাসন অবলীলাক্রমে উঠে যেতো। এর ফলে প্রশাসন এসে যেতো জনগণের হাতের নাগালে। যাবতীয় প্রশাসনিক সমস্যার স্থানীয় ভিত্তিতে দ্রুত সমাধান হতো। এ ব্যবস্থায় ফাইলিং নোটিং ফর্মালিটি ও দীর্ঘসূত্রিতার অভিশাপ থেকে জনগণ পরিত্রাণ পেতো। প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ওপর থেকে নিম্নস্তরে প্রশাসনিক আদেশ নিয়ম-কানুন ও কর্মসূচী চাপিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত পদ্ধতিতে প্রশাসনিক কার্যাবলী নিম্নতম পর্যায় থেকে উচ্চতর স্তরেই শুধু সুপারিশ করা নয়, নিম্নতর স্তরেই যাবতীয় কার্যাবলীর বাস্তবায়নের ব্যবস্থা থাকতো, উচ্চতর স্তর থেকে শুধু অর্থ ও সরকারি নীতি সরবরাহ করা হতো, আর নিম্নতর স্তরে সরকারি নীতি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা থাকতো।

এ ব্যবস্থায় প্রতিটি প্রশাসনিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত হতো জনগণের নেতৃত্ব। গ্রাম-সমবায় পরিচালনার সার্বিক ক্ষমতা থাকতো গ্রামের জনসাধারণের ওপর। সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে শুধু পর্যবেক্ষণের কার্যাবলী গ্রহণ করা হতো। থানা প্রশাসনিক পরিষদের প্রশাসক/ চেয়ারম্যান এবং জেলা প্রশাসনিক পরিষদের গভর্ণর জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। উভয় প্রশাসনিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা এসে যেতো গ্রামীণ জনগণের মধ্য থেকে, ফলে এখানে জনগণের প্রাধান্য বা ক্ষমতা সংহত হতো। সর্বস্তরে সরকারী কর্মচারীগণ জনগণের প্রতিনিধিদের

নিয়ন্ত্রণে থাকতো। এতে করে জনগণই প্রশাসনকে পরিচালিত করতো। এভাবেই একটি জনগণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু হতো এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা শুধুমাত্র জাতীয় সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্র বঙ্গভবন বা গণভবন ও সচিবালয়ের উঁচু দেয়ালের সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো না। প্রশাসনের সর্বস্তরে জনগণের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের ফলে প্রশাসনিক ক্ষমতার ৯৫% ভাগ আসন জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে এসে যেতো। ফলশ্রুতিতে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা, স্থবিরতা, ফর্মালিটি, দুর্নীতি, হয়রানী ঘুষনীতির খোঁয়াড় প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামো চিরদিনের মতো উচ্ছেদ হয়ে যেতো—জনগণ তাদের ইচ্ছায় ও প্রয়োজনে প্রশাসনকে তাদের কাজে লাগাবার অপূর্ব সুযোগ পেতো।

এ ব্যতীত বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ও তার ফলাফল কী হতো তা ঐ বিষয় আলোচনাকালে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাই এ বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।

বঙ্গবন্ধুর 'দ্বিতীয় বিপ্লব' তথা বাকশালের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও প্রশাসনিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হল আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদের দালাল এজেন্ট বহুজাতিক সংস্থা ও দেশীয় দালাল প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও শোষক পরজীবিগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও শোষণের চিরাবসান ঘটতো। বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত পদক্ষেপসমুহের সুদূরপ্রসারী ফলাফল অনুধাবন করে সাম্রাজ্যবাদ ও তার এদেশীয় সেবাদাস-অনুচর-এজেন্টরা প্রমাদ গণলো। উপায়ন্ত না দেখে তারা বেছে নিলো মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের পথ। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন হলেন সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের একনিষ্ঠ সেবাদাস অনুচর মোশতাক-জিয়া ও তাদের সাঙ্গাতরা। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীচক্রের দেশীয় নেতৃত্ব প্রদান করলেন যে মোশতাক-জিয়া তারা উভয়েই ছিলেন বাকশাল নির্বাহী পরিষদের সদস্য। এ ব্যতীত উভয়েই ছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিতর্কিত ব্যক্তি। মোশতাক মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন সময় তাঁর প্রভূ শক্তি সাম্রাজ্যবাদের ইংগিতে পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন গঠনের অপপ্রয়াস চালিয়ে মূলতঃ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিলেন। অপরদিকে জিয়াউর রহমান পাক সামরিকচক্রের এজেন্ট হিশেবে মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত ঘোষক সেজে কৌশলে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দখল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন যাতে পরিণামে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বানচাল হয়ে যায়। এ ষড়যন্ত্র তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিযোদ্ধারা ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বভাবসুলভ বিশাল অন্তরের ক্ষমা প্রদান করে এই দুই ব্যক্তিকে

পরম আস্থার সাথে ক্ষমতার মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে তারা তাদের ভুল শুধরে নিতে পারেন। কিন্তু 'চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী' এই নীতিতে পথভ্রষ্ঠ হয়ে তারা স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে রাতের অন্ধকারে নির্মমভাবে হত্যা করে। এভাবেই মোশতাক রাষ্ট্রপতি এবং জিয়াউর রহমান প্রধান সেনাপতির পদ দখল করেই বাকশাল কর্মসূচী বাতিল করে দেন। বাতিল করে দেন মহান মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় মূল্যবোধ। স্বাধীনতাকে হেয়-অপদস্ত করে জনগণের মনে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলেন যাতে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সাথে একীভূত করা সহজতর হয় এবং এভাবেই আধুনিক বাংলাদেশের সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লবের অগ্রগতির ধারাকে উল্টোখাতে প্রবাহিত করার যাবতীয় কারসাজি ও ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদ, তার মিত্রসমূহ ও তাদের স্বশ্রেণীর শাসন-শোষণ ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার হীন লক্ষ্যে গ্রহণ করা হলো, যেমন হয়েছিলো ইসলামের ইতিহাসে এজিদের নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান—যার ফলে ইসলামের সাম্যবাদী সূর্য চিরদিনের মতো স্তিমিত হয়ে যায়। এ জাতীয় আরো অনেক প্রতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় পৃথিবীর অগ্রগতির ইতিহাসের পাতায়। তবে ইতিহাসের অগ্রগতির চাকাকে উল্টোদিকে ঘুরায় এমন সাধ্য কার ? সাময়িককালের জন্যে হয়তো অগ্রগতিকে রোধ করা যায়, চিরকালের জন্যে নয়। যতোটুকু আঘাতে অগ্রগতিকে রোধ করা যায়, ঠিক ততোটুকু প্রত্যাঘাতে অগ্রগতির ধারার পুনরুত্থাণ ঘটে। এ কথা পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ কারণেই বিজ্ঞানের একটি সূত্রে বলা হয়েছে ঃ 'Every action has got its own equal and opposite re-action.

বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারায় সামাজিক বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

পূর্বাধ্যায়সমূহে আমরা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসিক ও দার্শনিক ভিত্তি এবং তাঁর গৃহীত ও পরিকল্পিত পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তাঁর জীবনের সমগ্র রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক প্রশাসনিক চিন্তাধারা ও কর্মসূচী সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 'দ্বিতীয় বিপ্লব' তথা বাকশাল ব্যবস্থার মধ্যে। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বাকশাল কর্মসূচীকে তিনি বাস্তবায়িত করার কোনোই সময় সুযোগ পাননি। বাংলাদেশের ব্যাপক শোষিত অবহেলিত অজ্ঞ দরিদ্র সাধারণ মানুষ তাই বাকশাল বা 'দ্বিতীয় বিপ্লব' সম্পর্কে কোনোই ধারণা নিতে পারেনি এবং বুঝতে সুযোগ পাননি যে, উক্ত ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়িত হলে তাদের জীবনে কি ফলাফল প্রতিফলিত হতো। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত ও রাজনীতিসচেতন মানুষগুলো কি কিছু বুঝতে বা ঠাওর করতে পেরেছিলেন? বুঝতে চেষ্টাও কি করেছিলেন?

মোট কথা, বাংলাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ও পরিকল্পিত কর্মসূচীর সুদূরপ্রসারী ফলাফল নির্ণয় করতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, তবে সাম্রাজ্যবাদ, পেট্রোডলারী সাম্রাজ্যবাদ ও চৈনিক হঠকারীবাদ এবং তাদের এদেশীয় সেবাদাস এজেন্ট অনুচর রাজনীতিকরা ও শোষকগোষ্ঠী এর ফলাফল ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের ফাইনান্স ক্যাপিটালের লীলাখেলা, শোষণ, প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক (পুঁজিবাদী রাজনীতি) আধিপত্যবাদকে বাংলার মাটি থেকে চিরদিনের মতো ঝেটিয়ে বিদায় দিচ্ছেন, এটাই তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তারা হাত-পা গুটিয়ে নীরবে নিভৃতে সুবোধ শিশুর মতো বসে থাকেনি। তারা রাতের অন্ধকারে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে লাগলো। এমনি অবস্থায় তারা সামরিক বাহিনীর কতিপয় বিপথগামী উচ্চাভিলাষী সদস্যদের মোটা অংকের টাকায় ভাড়া করে ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে, তাদের দিয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে নির্মমভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এবং তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে।

যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সামজিক বিপ্লবের প্রেক্ষাপট রচনা করে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে একটি শোষণহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছিলেন, দেশী-

বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী গণবিরোধী সমাজতন্ত্র বিরোধীচক্র সেই বিপ্লবের ধারাকে উল্টোপথে প্রবাহিত করার যাবতীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে, যার ফলে মাত্র ক' বছরের মধ্যে ২ জন কোটিপতির স্থলে কয়েক শতাধিক কোটিপতি পরিবারের জন্ম হয়েছে, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৫% ভাগ। জনসাধারণের ঐক্য হয়েছে অবাধ-মুক্ত বা তথাকথিত বহুদলীয় রাজনীতির হোলিখেলায় পর্যুদস্ত। জনসাধারণ হচ্ছে শোষিত অবহেলিত লাঞ্ছিত। তাদের অধিকাংশের পেটে ভাত নেই, পরনের বস্ত্র নেই , মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, শিক্ষার সুযোগ নেই, তাদের চিকিৎসার সুযোগ নেই। তারা আজ সর্বশান্ত-সর্বহারা। এটাই হলো ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলাফল; প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু প্রকৃত বিপ্লবের অর্থ এ সবের সুষ্ঠুভিত্তিক সমাধান, যে বিপ্লব বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন।

এ অধ্যায়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারায় সামাজিক বিপ্লবের অর্থ, এর গতি-প্রকৃতি, পার্টি ও জনগণের সাথে বিপ্লবের কী সম্পর্ক এবং বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী, সে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। কারণ সামাজিক বিপ্লব ব্যতীত শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ কল্পনাও করা যায় না।

রাজনৈতিক দর্শন যেমন আর্থ-সামাজিক প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক গতিপ্রকৃতির দিক নির্দেশ করে, তেমনি বিপ্লব সমাজের মন-মানসিকতার কূপমণ্ডুকতা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ও কুপ্রথাতে সমূলে উৎপাটিত করে সমাজকে গতিশীল, কল্যাণকর ও প্রগতিমুখী করে তোলে। রাজনীতি অর্থনীতিকে ব্যাপক মানুষের আকাংখা পূরণের দিকে নিয়ে যায়। কারণ বিপ্লব ও ব্যাপক মানুষ একে অপরের ধারক-বাহক শক্তি; ব্যাপক মানুষের হৃদয়াবেদন ও সমস্টিগত কল্যাণ চিন্তাচেতনা থেকেই বিপ্লবের উত্তরণ ঘটে।

কিন্তু আমাদের দেশে বিপ্লবের অর্থ, এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে অনেক ভ্রান্তধারণা প্রচলিত আছে। যেমন, অনেকে মনে করেন, কোন একটি রাজনৈতিক দল বা একটি গোষ্ঠী কিছু সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন রাজনৈতিক দলীয় সরকারকে বা সরকারের গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের হত্যা করে একটা বিশৃংখল ও রক্তাক্ত সংঘর্ষের মাধ্যমে সমাজের কোন একটা পরিবর্তন বা ক্ষমতার হাত বদল হলেই তাকে বিপ্লব বলে। আবার অনেকে মনে করেন যে, যা কিছু সমাজে প্রচলিত আছে, আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতি, আইন-শৃংখলা ইত্যাদি উৎপাটিত বা ধ্বংস করার নামই বিপ্লব। অর্থাৎ তাদের ধারণাঃ রক্তপাত, সংঘর্ষ, ধ্বংস বিশৃংখলা ইত্যাদি কার্যক্রমের নাম বিপ্লব; প্রগতিশীল কাজ। তারা

একটু তলিয়ে দেখেন না যে, যারা প্রতিক্ষণ প্রতিনিয়ত সমাজের মঙ্গল, স্বার্থ, সুখ, সমৃদ্ধি ইত্যাদির জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নতুন নতুন সৃষ্টিশীল কাজের মধ্য দিয়ে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখছে, চলমান ও সজীব করে রাখছে, সেই শ্রমজীবি মেহনতী মানবগোষ্ঠীর স্বার্থ এ-সব কার্যক্রমের ভেতর আছে কি, নেই।

সুতরাং ওগুলো সবই ভ্রান্তধারণাই শুধু নয়, বিপ্লবের নামে প্রতি-বিপ্লবী কার্যক্রম বা সন্ত্রাসবাদী ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম দিয়ে বিপ্লবকে কলুষিত করার সামিল। বলাই বাহুল্যঃ তথাকথিত এই বিপ্লবের চিন্তাধারার সাথে সমাজের ব্যাপক শ্রমজীবি মেহনতী মানবগোষ্ঠীর স্বার্থের কোনোই সম্পর্ক নেই।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু যথার্থই বলেছেন, 'বিপ্লব হবে এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, তাদের বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণের নিমিত্তে, ভাঙ্গা, ধ্বংস, ক্ষয়, বিশৃংখলা, রক্তপাত, হিংসা কোনোটাই বিপ্লবের নীতি নয়। কারণ সমাজে যারা সৃষ্টি করে, ভাঙ্গা বা ধ্বংস তাদের অভিপ্রায় নয়। যে গড়ে সে জানে গড়ার কী মূল্য। তবে তাদের কল্যাণে যতোটুকু ভাঙ্গার দরকার তারা ততোটুকুই ভাঙ্গতে রাজী, এর বেশি নয়। তাই মনে রাখতে হবে, সামাজিক বিপ্লবের অর্থ রক্তপাত, ধ্বংস ও ক্ষয় নয়। এর অর্থ সামাজিক সার্বিক উন্নতিসাধন অগ্রগতি সাধন' এটাই প্রগতিশীল চিন্তাধারা।

বস্তুতঃ বিজ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন, উৎপাদন সম্পর্কের বিজ্ঞানসম্পত বিবর্তন, উৎপাদনোপকরণের উন্নয়ন, যাবতীয় উন্নয়নমূলক ও জনস্বার্থের কার্যক্রমে বিজ্ঞানের বিকাশ ও সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ বিহীনভাবে অধিকতর নয়া নয়া সম্পদ সৃষ্টিই বিপ্লবের প্রকৃত অর্থ, যার সাথে সমাজের ব্যাপক জনগণ তথা শ্রমজীবি মেহনতী মানবগোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত। মানুষের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি তথা সাবির্ক কল্যাণই হলো বিপ্লবের উদ্দেশ্য আদর্শ ও লক্ষ্য।

সেই আদিকাল থেকেই সামাজিক বিপ্লবই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে এবং এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। বর্তমান বিংশ শতাব্দি হলো বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগ। প্রগতির যুগ, কল্যাণের যুগ। তবে শোষণ অত্যাচার বঞ্চনা বৈষম্য -পূর্বের তুলনায় মোটেও কমেনি। সেই দাসপ্রথা থেকে শুরু করে বর্তমানকালের ধনতান্ত্রিক প্রথা পর্যন্ত সামগ্রীকভাবে শোষণ ও অত্যাচার ঠিকই প্রবহমান রয়েছে। কিন্তু তাই বলে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সেই দাস প্রথা থেকে শুরু করে একটার পর একটা সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্র অতিক্রম করে যে ধনতান্ত্রিক প্রথার আবির্ভাব ঘটেছে তাতে সমাজে ও মনুষ্যজীবনে মৌলিক পরিবর্তনও এসেছে অধিকতরভাবে। দাসপ্রথা, ভূমিদাস প্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক প্রথা

থেকে ধনিকপ্রথা ঢের বেশি কল্যাণকর। সামগ্রীকভাবে বিচার করলে সহজেই আমরা বুঝতে পারি যে, দাসপ্রথা আদিম সাম্যবাদী সমাজের অবলুপ্তি ঘটিয়েছে, মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিভক্তি, শোষণ অত্যাচার, বঞ্চনা থেকে মুক্তির সংগ্রামও শুরু হয়েছে, সমাজের ব্যাপক শ্রমজীবি মেহনতী মানবগোষ্ঠীকে সার্বিকভাবে সচেতন করে দিয়েছে। ফলে মানবজাতির সুখ-সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতরভাবে সম্প্রসারিতও করেছে।

বিপ্লবের লক্ষ্য কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর কল্যাণসাধন নয়। উৎপাদন শক্তির দ্রুতোন্নতি এবং উৎপাদন বন্টননীতির সম্পর্কের অগ্রগতি নিশ্চিতকরণই বিপ্লবের ও বিপ্লবীদের লক্ষ্য। একটা কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, সমাজের সামগ্রীক অগ্রগতি কল্যাণ উন্নতি তথা উৎপাদনের বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সকল বিপ্লবীরা মূলতঃ শ্রমিক মেহনতী জনতা থেকে আগত। স্বভাবতঃই তাদের সমষ্টিগত স্বার্থের অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য শ্রেণী তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এ জাতীয় বিপ্লবের সকল শক্তিই বিপ্লবসৃষ্ট সমৃদ্ধির সম-অংশীদার। তবে এ কথা সত্য যে, বিপ্লবের সামগ্রীক নেতৃত্বে থাকবে শ্রমজীবি মেহনতী মানবগোষ্ঠী। এরাই হলো সমাজের বৃহত্তম অংশ, এরা মূলতঃ সর্বহারাশ্রেণী। বিপ্লবের খরস্রোতে এদের তাই হারাবার কিছু নেই। বিপ্লবের সাথে এদের বিশ্বাসঘাতকতা বা হঠকারীতা করার প্রশ্নই ওঠে না। এরাই হলো বিপ্লবীশ্রেণী। সমাজের প্রভাবশালী, প্রতাপশালী, কৃর্তৃত্বশীল শ্রেণী যখন উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে, উৎপাদনশক্তির স্বভাবগত বিকাশে অনীহা প্রকাশ করে, উপরন্ত এ সবের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে ওঠে তখনই সমাজ বিকাশ ও উৎপাদনের অবাধ ও নিয়ন্ত্রণবিহীন বৃদ্ধির স্বার্থেই বিপ্লবের প্রয়োজন।

পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনবৃদ্ধির কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হলেও মূলতঃ ধনিকশ্রেণী উৎপাদনবৃদ্ধিতে মোটেই আগ্রহী নয়; শিল্প-কলকারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদনবৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা সমাধানের গালভরা শ্লোগান দিয়ে তথাকথিত শিল্প বিপ্লবের নামে, উৎপাদনের বিপ্লবের নামে ডামাডোল পেটালেও অন্তরালে থাকে তাদের অর্থ আত্মসাত করে সীমাহীন ব্যক্তিসমৃদ্ধি গড়ার উদগ্র অভিলাষ এবং তারা শিল্পায়নের নামে ব্যাংক থেকে মোটা অংকের অর্থ তুলে তার সিংহভাগই আত্মসাৎ করে থাকে; এর একটা অংশ ক্ষমতাসীন সরকারের কর্তাব্যক্তিদের উপঢৌকন দিয়ে থাকে তাদের বিভিন্ন প্রকল্প পাশ ও পরবর্তীতে ব্যাংকের টাকা ফেরৎদানের ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার লক্ষ্যে। এর প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আশীর্বাদপুষ্ট সামরিক স্বৈরাচারী সরকার তাদের স্বগোত্রীয় শ্রেণীর মাধ্যমে দেশকে পুঁজিবাদীধারায় পরিচালিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারী ব্যাংক থেকে শিল্পায়নের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়ে এর সামান্য একটা অংশমাত্র কাজে লাগিয়েছে, বাকী সিংগভাগ টাকাই তারা ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছেন। হাজার হাজার কোটি টাকা এভাবে অনাদায়ী হয়ে রয়েছে যা আদায় করার কোনো কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। মাঝে মাঝে যদিও এ ব্যাপারে একটা লোক দেখানো পদক্ষেপ নেয়া হয় কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এসব করা হয় নিজেদের পকেটে কিছু আসার লক্ষ্যে। মূলতঃ নানান কলাকৌশল ও শঠতার মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন সীমাবদ্ধ রাখা, উৎপাদন হ্রাস; কৃষি ও শিল্পের পরিপূর্ণ ব্যবহার না করা, তীব্র বেকার সমস্যা সৃষ্টি করা, কৃত্রিম বাজার সংকট সৃষ্টি করা, খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী গুদামজাতকরণের মাধ্যমে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর সংকট সৃষ্টি করা, বৈজ্ঞানিক ও প্রাকৃতিক উপকরণ বা শক্তিকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে না লাগানো—গড়িমসি করা, সন্ত্রাসবাদী ধ্বংসাত্মক বিশৃংখল তৎপরতা সৃষ্টি করা, অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ সৃষ্টি করা, হিংসাত্মক ও গৃহযুদ্ধ বা যুদ্ধবিগ্রহের পরিবেশ সৃষ্টি করে উৎপাদন শক্তির অপব্যয়, অপচয়, অপব্যবহার ইত্যাদি কার্যকলাপ পরিচালনা করাই পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক প্রথার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং এটাই মূলতঃ এ প্রথার অন্যতম আদর্শও বটে। কায়েমী স্বার্থবাদী শোষক-প্রতিক্রিয়াশীল এই চক্রের কার্যকলাপের হোলিখেলা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হলো শ্রমজীবি মেহনতী শোষিত মানুষের সর্বাত্মক বিপ্লব। এর ফলে উভয় শ্রেণীর দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে উৎপাদন ব্যবস্থার সাময়িক কিছু ক্ষতি হতে পারে কিন্তু সমাজ বিকাশের অগ্রগতির স্বার্থে কিছু ক্ষয়ক্ষতিকে মেনে নিতে হবে। তবে বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের সাথে দ্বন্দে বা বিপ্লবে লিপ্ত হয়ে নিজেরা ইচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদনযন্ত্র ধ্বংস হতে পারে, উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে এমনতর ক্ষতিকর কিছু করবে না। মনে রাখতে হবে যে, হঠকারীতা, খামখেয়ালীপনা, স্বেচ্ছাচার, সন্ত্রাস, নিছক রক্তপাত ইত্যাদির অর্থ বিপ্লব নয়। বিপ্লবীরা প্রথমে আঘাত করবে না, প্রতিপক্ষের আঘাতকে প্রতিরোধ করবে মাত্র। স্বাভাবিক যা-তাকে প্রসন্নচিত্তে মেনে নেয়াই বিপ্লবীদের ধর্ম, বিপ্লবের ধর্ম।

আরো একটা কথা বিপ্লবীদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বিপ্লবীরা হলো সমাজের বৃহত্তম অংশ, প্রতিপক্ষ সে-তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। সামাজিক বিপ্লবের স্রোতধারায় এই ক্ষুদ্র অংশ খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে অবশ্যই। বিপ্লবীদের ফসল অর্থাৎ সমাজের সর্বক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণভার বিপ্লবীদের বা শ্রমিক জনতার দখলে

এসে যাবে, তখন যা-কিছু থাকবে সেসবের মালিক হবে এই বিপ্লবীরা তথা শ্রমজীবি মানবগোষ্ঠী। অতএত এই বিপ্লবী জনগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থেই কোনো প্রকার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হবে না। আরেকটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, অবাধ উৎপাদন ব্যবস্থা চালু থাকা অবস্থায় কোনো হটকারী নেতৃত্বদ্বারা প্ররোচিত হয়ে কোনো শ্রেণীকে উৎখাত করার অর্থই বিপ্লবের অপমৃত্যু। বিপ্লবের ধারা প্রবহমান রাখতে হবে বিপ্লবেরই স্বার্থে। উৎপাদনের স্বার্থে। ব্যাপক মেহনতী মানুষের স্বার্থে। এটাই হলো বিপ্লবের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অন্তর্ঘাত, সন্ত্রাসবাদ, নিছক রক্তপাত, উৎপাদন ব্যাহত করা ও হিংসাকে বিপ্লবের মধ্যে গণ্য করা যায় না। এটা প্রকৃত বিপ্লবীদেরও অভিপ্রায় নয়। এগুলো হলো কায়েমী স্বার্থবাদীচক্রের কাজ। এরা জোর-জুলুম, রক্তপাত, হিংসা, উৎপাদন ব্যাহত প্রভৃতি কার্যকলাপের দ্বারা বিপ্লবের স্বাভাবিক স্রোতধারাকে উল্টোখাতে প্রবাহিত করতে চায়। কায়েমী স্বার্থবাদীমহলের এ-সব প্রচেষ্টাকে 'প্রতিবিপ্লব' বলা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে যারা সমাজ বিকাশের ধারাকে প্রতিহত করে সমাজকে পেছনে টেনে রাখতে চেষ্টা করে তারাই প্রতিবিপ্লবী। তাই বিপ্লবীরা চাক বা না চাক বিপ্লবকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদী এই প্রতিবিপ্লবীরা হিংসা অন্তর্ঘাত ও রক্তপাতের আশ্রয় গ্রহণ করে, গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য বিপ্লবীদেরও আত্মরক্ষার জন্যে স্বাভাবিক ও অনিবার্যভাবেই রক্তপাতের মধ্যে নামতে হয়। অর্থাৎ আঘাতের প্রত্যাঘাত করতে অনিবার্যভাবেই রক্তপাতমূলক কার্যকলাপ এসে যায়। তাই দেখা যাচ্ছে যে, বিপ্লব এবং রক্তপাত অবিচ্ছেদ্য। কায়েমী স্বার্থবাদীচক্র যদি ব্যাপক মেহনতী জনগণের মৌলিক মানবাধিকার ও তাদের আশা আকাংখার ক্ষেত্রে রক্তাক্ত ও হিংসাত্মক বাধার সৃষ্টি না করে তাহলে বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে বল প্রয়োগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বা বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে সখ করে হিংসা গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাতের আশ্রয় গ্রহণের কোনো অবকাশ নেই। আবার কোন অত্যাচারী ব্যক্তি বা বিশেষ কোনো শ্রেণীর বিরুদ্ধেও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য বিপ্লব সংঘটিত হয় না। সামগ্রীকভাবে সমাজ বিকাশের লক্ষ্যেই বিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাকে। রক্তপাত হিংসা ধ্বংস বিশৃংখলা সমাজ বিকাশের অন্তরায়। প্রতিবিপ্লবীদের চাপিয়ে দেয়া হিংসাত্মক রক্তাক্তনীতি প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার জন্যে (আত্মরক্ষামূলক) যতটুকু বলপ্রয়োগ ও রক্তপাতের প্রয়োজন বিপ্লবীরা ততটুকুই সমর্থন করে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সামাজিক বিপ্লব সেই সাক্ষ্যই বহন

করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের হিংসাত্মক কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থাই সেসব ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। ইসলামী বিপ্লব, মহান রুশ বিপ্লব, ভিয়েতনাম বিপ্লব, চীন বিপ্লব, কোরিয়ান বিপ্লব, কিউবান বিপ্লব, অন্যান্য দেশের সামাজিক বিপ্লব এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিপ্লব ইতিহাসের ব্যতিক্রম নয়।

১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার মহান সামাজিক বিপ্লবকে এক কথায় বলা যেতে পারে একটি রক্তপাতহীন সফল বিপ্লব। এই বিপ্লবের পর শ্রমিক শ্রেণীর হাতে যে ক'দিন ক্ষমতা ছিলো, সে-সময়ের মধ্যে কোন হিংসাত্মক ও রক্তাক্ত কার্যকলাপ সংঘটিত হয়নি। এমন কি এও জানা যায় যে, বিপ্লবে বিজয়ী একদল ক্ষুধার্ত বিপ্লবী হাতের কাছে অতি দামী খাদ্যসামগ্রী পড়ে থাকলেও তা তারা স্পর্শ করেনি। এ থেকে বিপ্লবীদের নির্লোভ ও আত্মসংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে অবশ্য দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী ও ধনিক শোষকগোষ্ঠীর হিংসাত্মক ও রক্তাক্ত আক্রমণ শুরু হলে তখন বাধ্য হয়েই বলপ্রয়োগ করে শ্রমিকশ্রেণী রক্তাক্তপথেই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শোষকগোষ্ঠীকে পদানত করে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। মহান রুশ বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য ইত্যাদি বিষয়ে একে একমাত্র ইসলামী বিপ্লবের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে পাক সামরিক বাহিনী তথা শোষকগোষ্ঠী ও তাদের তাবেদাররা ১৯৭১ সালে বাঙ্গালী জাতির ওপর হিংসাত্মক ও রক্তাক্ত কার্যকলাপ চালিয়ে দিয়েছিলো, ফলশ্রুতিতে বাঙ্গালী জাতি সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং পরিণামে রক্তাক্ত পথেই বাঙ্গালীর জয় সূচিত হয়। রুশ শ্রমিক জনতা বা বাঙ্গালী জনগণ যদি প্রতিবিপ্লব-প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের বিরুদ্ধে এ ধরনের পথ গ্রহণ না করতো, তাহলে অবশ্যই ঐ চক্রের জয় হতো। অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার বিপ্লবের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

মানবসমাজের সামগ্রীক অগ্রগতির প্রয়োজনেই বিপ্লব। বিপ্লবের সাথে তাই শ্রমজীবি মেহনতী মানুষের নিবিড় সম্পর্ক। অতএব সমাজের এই বৃহত্তম শ্রেণীর জনগণের সাহায্য সহযোগিতা সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত বিপ্লব সংঘটিত ও সফল হতে পারে না। তাই কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল বা সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা দখলের নাম বিপ্লব নয়। সমাজের সর্বস্তরের শোষিত মেহনতী মানুষকে তাদের অধিকার সর্ম্পকে সচেতন করা, বিপ্লবী পার্টি গঠন করা, বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা ও শিক্ষা দেয়া, সমাজ বিকাশের কি প্রয়োজন সে-সম্পর্কে তাদের জ্ঞাত করা, সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান, শ্রমজীবি জনতাকে

বিভিন্ন পেশাভিত্তিক শ্রেণীসংগঠনে সংগঠিত করা ইত্যাদি হলো বিপ্লবের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক। এর বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই মহান লেনিনের নেতৃত্বে বিভিন্ন শ্রেণী সংগঠনের এককসত্তা হিশেবে বলশেভিক বা কমিউনিস্ট পার্টি, হোচিমিনের নেতৃত্বে ১৪ টি রাজনৈতিক ও শ্রেণী সংগঠনের এককসত্ত্বা হিশেবে লিবারেশন ফ্রন্ট, মাওসেতুংয়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন সংগঠনের এককসত্ত্বা হিসেবে কমিউনিষ্ট পার্টি, কিম ইল সুং, মার্শাল টিটো, ডঃ ফিডেল ক্যাস্ট্রো প্রমুখ বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণীসংগঠন ও রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত এককসত্ত্বার রাজনৈতিক পার্টির সন্ধান পাওয়া যায়। তদ্রূপ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতার সপক্ষীয় পার্টিসমূহের একক প্লাটফরম হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা বাকশাল।

সুতরাং বিপ্লব সংঘটিত ও বিপ্লবকে প্রবহমান রাখার স্বার্থেই বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে একক বিপ্লবী পার্টির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। ঐক্যবিহীন কোন বিপ্লব, আদর্শবিহীন কোন বিপ্লব সফল হতে পারে না। যারা মনে করেন একটা (জনসমর্থনবিহীন) সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই বিপ্লব সফল হতে পারে, তারা প্রকৃতই বিপ্লবের অর্থ বোঝেন না। সেক্ষেত্রে তাদের বিপ্লব হঠকারীতায় পর্যবশিত হয়ে পড়ে এবং তারা প্রতিবিপ্লবকেই সুযোগ করে দেয়।

প্রতিবিপ্লবের চরিত্র এবং এর পশ্চাতে দেশী-বিদেশী কী ধরনের শক্তিসমূহ কাজ করে থাকে তার প্রমাণ আমরা আমাদের মুক্তি সংগ্রামকালে এবং ১৯৭৫ সালের নির্মম হত্যাকান্ডের সময় দেখেছি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় রুশ-চীন-ইন্দোনেশিয়া-স্পেন-ফরাসী প্রভৃতি দেশের ইতিহাসেও। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেশে যেসব বিপ্লবের কথা ফলাও করে প্রচার করা হয় বা বিশেষ করে পাকিস্তানের 'অক্টোবর বিপ্লব', বাংলাদেশের তথাকথিত 'আগষ্ট বিপ্লব', 'নবেম্বর বিপ্লব' এর প্রতিবিপ্লবী সামরিক প্রতিক্রিয়াশীলচক্র যেহারে 'বিপ্লব' বিপ্লব,' বলে মাতামাতি করেন, তা আদৌ বিপ্লবের পর্যায়ে পড়ে না। এ সবই হলো একশ্রেণী বা একটা ভিন্ন দলীয় সরকার বা একই দলীয় সরকারের বিরুদ্ধে অন্য একটি দল গোষ্ঠী বা সরকারের অভ্যন্তরে লুকায়িত একটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীর সশস্ত্রপন্থায় ক্ষমতা দখলের বিদ্রোহ। এই সব তথাকথিত বিপ্লবের সাথে উৎপাদনের অগ্রগতি, সমাজ বিকাশ ও শ্রমজীবি মেহনতী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কোনোই সম্পর্ক নেই। এটা একই শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত বা দ্বন্দ্ব অথবা একটা বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থোদ্ধারের অপচেষ্টা বা একটা প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের হাত

থেকে অন্য আরেকটি প্রতিবিপ্লবী চক্রের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর বা ক্ষমতার হাত বদল বৈ অন্য কিছু নয়। এ সবাই হলো প্রতিবিপ্লবী কার্যক্রম। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের অর্থ একটি প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের হাত থেকে একটি সাম্যবাদী বিপ্লবীশ্রেণীর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর; প্রতিক্রিয়াশীল ধনতান্ত্রিক শোষণভিত্তিক আর্থব্যবস্থার পরিবর্তে প্রগতিশীল বা সমাজতান্ত্রিক শোষণহীন আর্থসামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার গুণগত মৌলিক পরিবর্তন সাধনই বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

বিপ্লব জনগণ পার্টি এবং গণশ্রেণী সংগঠন পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যান্যটি কল্পনা করা যায় না। বিশেষ করে গণশ্রেণী সংগঠনগুলোই হলো 'বিপ্লব' সৃষ্টির মিলনায়তন। বিপ্লবের অর্থ শিক্ষাও বটে। গণসংগঠনগুলোর মাধ্যমে শুধু শ্রমজীবি মেহনতী মানুষগুলোকেই শুধু শিক্ষিত করে তোলা হয় না, বিপ্লবীরাও শিক্ষালাভ করে থাকে। জনসাধারণের শ্রেণী বা পেশাভিত্তিক মন-মানসিকতা চেনা-জানা, মেহনতী মানুষের সংস্পর্শে এসে একজন বিপ্লবী তাদের প্রতি সহমর্মী ও সহযোগী হয়ে উঠতে পারে। একজন খাঁটি বিপ্লবী হতে হলে জনগণের প্রতি ভালবাসা, মমতা, শ্রদ্ধা, বিপ্লবী জনশক্তির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস, বিপ্লবীদর্শনের প্রতি কর্তব্য ও বাস্তবনিষ্ঠা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ, সততা, সংযম, সহনশীলতা, অধ্যাবসায়, আত্মত্যাগ, উৎসর্গকৃত হৃদয়, আত্মপ্রত্যয়, ভদ্রতা, বিনয়ী, দুর্দম সাহস প্রভৃতি অর্জন করতে হবে। এ ব্যতীত পার্টির প্রতি আনুগত্য, নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল, সহকর্মীদের প্রতি মমত্ববোধ, পার্টির কর্মসূচীর প্রতি নিবেদিত প্রাণ সমর্থন প্রভৃতি গুণাবলীও বিপ্লবীদের অর্জন করতে হয়। এগুলো ব্যতীত বিপ্লবী হওয়া তো দূরের কথা, প্রতিক্রিয়ার জগন্য ক্রিড়নক হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। তাই মেহনতী শ্রমজীবি মানুষের গণসংগঠন—গণশ্রেণী সংগঠনগুলোর নৈমিত্তিক কাজে পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করা বিপ্লবী জীবন বিকাশের একমাত্র শিক্ষা। শুধু বিপ্লবী তত্ত্বচর্চা করলেই চলবে না, বাস্তবে তা প্রয়োগও করতে হবে। সুতরাং বিপ্লবী হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার যদি উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করা না যায়।

এটা পুরোপুরি বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক সত্যের মতোই সমাজবিপ্লবও নির্ঘাত সত্য। এ প্রসঙ্গে অবশ্য প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন সমাজ বিপ্লব যখন বৈজ্ঞানিক সত্য,তাহলে পার্টির মাধ্যমে বিপ্লবী প্রচেষ্টার কী প্রয়োজন, বিপ্লব আপনা থেকেই ঘটবে না, কোনো শান্তিপূর্ণ অহিংসপন্থায় বিপ্লব কি সফল হতে পারে না বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লব সম্পন্ন ও সফল হতে কি পারে না? প্রশ্নগুলো খুবই যুক্তিসঙ্গত

সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপ্লব অনিবার্য সত্য, এর অর্থ এই নয় যে, ম্যাজিকের মতো অবলীলাক্রমেই বিপ্লব সাধিত হবে। মনে রাখতে হবে, বিপ্লবের কোন রূপসত্ত্বা নেই, বিপ্লব নিজে কোন কিছুই করতে পারে না বা এর নিজস্ব কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। মানুষই হলো বিপ্লবের ধারক ও বাহক। মানুষই তার প্রয়োজনে বিপ্লব সৃষ্টি করে। কারণ বিপ্লব ব্যতীত সামাজিক বিকাশ সাধিত হয়নি; হয় না। বিপ্লবই সমাজের চালিকা শক্তি। যেমন একেবারে আদিতে মানবগোষ্ঠী বর্তমান মানবগোষ্ঠীর রূপাকারে ছিলো না বলে বিজ্ঞানী ডারউইন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিবর্তনবাদের মধ্য দিয়েই মানুষের রূপ ও আকার পরিগ্রহ করেছে। পবিত্র কোরানও একই ধারণার আভাষ দিয়েছেন। যেমনঃ "We have created Man into toil and struggle" অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে শ্রম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এখানেও তাহলে বিবর্তনবাদের কথা এসে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সংগ্রাম বা বিপ্লবই মানুষের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ বিবর্তনবাদই বিপ্লব। সমাজের বিকাশ সাধিত হয়ে থাকে বিবর্তনবাদের ভিত্তিতে।

তাই ঐতিহাসিক কারণে তথা মানুষ তাদের প্রয়োজনেই বিপ্লবের জন্যে প্রচেষ্টা চালাবে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষকে কোন শক্তি বিপথগামী করতে পারবে না—কোনো বাধাবিপত্তি তাদেরকে এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। এ সব কারণেই বিপ্লব অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী। মনে রাখতে হবে যে, সমাজের উপাদান হলো মানুষরূপী বস্তু। এ বস্তু জীবন্ত। এ বস্তু বাস্তব চিন্তা ও ধ্যান করতে পারে, পারে সে অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাতে মানুষের চিন্তাধারণা, তার প্রয়োজনানুযায়ী বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে কাজে প্রতিভাত হবে। এই চিন্তা ও ধ্যানানুযায়ী কাজ না করলে বিপ্লব সাধিত হওয়া তো দূরের কথা, এ প্রচেষ্টায় সৃষ্টি কায়েমী স্বার্থ সমাজকে পেছনদিকে টেনে নিয়ে সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতিকে দাবিয়ে রাখবে। তবে মানুষ যেহেতু তার চিন্তা সম্পর্কে সচেতন, তাই এই অবস্থা চলতে দিতে পারে না। তার বাঁচার তাগিদেই সে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটাই এই জীবন্ত বস্তুটির স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি।

সাম্যবাদীরা সমাজ বিপ্লবের জন্যে হিংসা-রক্তপাত ও বলপ্রয়োগের পক্ষপাতি নয়। কোনো বিপ্লবই তা চায় না। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, কোনকালে কোন বিপ্লবই রক্তপাতহীন, অহিংস ও শান্তিপুর্ণ উপায়ে সমাধা হয়নি। বিপ্লবকে সফল করতে হলে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই গৃহযুদ্ধ ও বলপ্রয়োগ কার্যক্রম এসে যায়। এটা সমাজ বিজ্ঞানের একটা নিয়ম। তবে এ নিয়মটাকে শোষকসমাজের চাপিয়ে দেয়া নীতি বলে গণ্য করা হয়। শ্রমজীবি মেহনতী মানুষের বিপ্লবী গতিধারা

বাধাপ্রাপ্ত হয় বলেই এটা দ্বন্দ্ব-সংঘাত-গৃহযুদ্ধ-বলপ্রয়োগ ও রক্তপাতে পর্যবশিত হয়। এটা তাই অবলীলাক্রমে সামাজিক নিয়মনীতিতে পরিণত হয়ে পড়েছে।

হিংসা শোষক সমাজের ভিত্তি। বলপ্রয়োগ করেই শোষকগোষ্ঠী তাদের সামাজিক কাঠামো টিকিয়ে রাখে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজন শ্রেণীসংগ্রাম। শ্রেণীসংগ্রাম এমনই একটা বিষয় যে, সমাজের বৃহত্তম অংশ তথা শ্রমজীবি মেহনতী শ্রেণী, শোষিত মানবগোষ্ঠী যারা চারিত্রিক প্রকৃতিগত দিক দিয়ে উন্নতিকামী ও প্রগতিশীল, শোষণহীন সমাজে বিশ্বাসী, তাদেরকে সমাজে টিকে থাকতে হলে কায়েমী স্বার্থন্বেষী শোষকশ্রেণীকে উৎখাত করা ব্যতীত বিকল্প কোনো পথ তাদের সামনে খোলা নেই। এ জন্যেই শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজন। সমাজে শোষক ও শোষিতশ্রেণী একই সঙ্গে অবস্থান নিলে যেমন শোষিত শ্রেণীর বাঁচার নিরাপত্তা থাকে না, তেমনি কোন উন্নতিও হতে পারে না। এ কারণেই কোন একটি প্রভাবশালী বা কর্তৃত্বশালী গোষ্ঠীকে প্রতিহত করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই ব্যাপক শ্রমজীবি মেহনতী মানবগোষ্ঠীর উপযুক্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনকরণ। এ রাজনৈতিক ক্ষমতা এমনিতেই অর্জিত হয় না। প্রয়োজন বল প্রয়োগের, প্রতিরোধের, গৃহযুদ্ধের, ইস্পাতকঠিন ঐক্যের। পরিণামে সংখ্যালঘু শোষক-প্রতিক্রিয়াশীল-প্রতিবিপ্লবীদের পরাজয় অবধারিত। এই নিয়মে অর্থাৎ শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ও পাল্টা ব্যবস্থা নিয়ে শোষকসমাজকে সমূলে উৎপাটিত করে শ্রেণী-শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বিকল্প কোন পথ নেই। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা, যার প্রমাণ রয়েছে ইসলামী বিপ্লবে, মহান রুশ বিপ্লবে তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সমাজ বিপ্লব ও শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসে।

শান্তি ও মানবতাবাদের উৎকর্ষ সাধনই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য। বিপ্লবী তথা সমাজতন্ত্রীরা তাই শান্তিকামী ও মানবতাবাদী। সমাজ ও জনগণের শান্তি সুখ সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধনই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাদের বিপ্লবী মানবতাবোধ সমাজের সার্বিক কল্যাণে নিবেদিত। অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাই এদের সংগ্রাম। বিপ্লবীরা কাপুরুষ নয়। মানুষের ওপর অন্যায়ের প্রতিরোধ না করে মৃত্যুকে বরণ করার অর্থ শান্তিপ্রীতি নয়। কোন কিছুতেই তারা হতাশ হবে না। অন্যায় অবিচার শোষণ ব্যাভিচারের অবসান ঘটিয়ে সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনবোধে সংগ্রাম চালিয়ে বীরের মতো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে। এ জাতীয় নির্দ্বিধায় জীবনদান করতে আমরা দেখতে পাই ইসলামী বিপ্লবে মহানবীর নেতৃত্বে, তেমনি রুশ বিপ্লবে মহান লেনিনের নেতৃত্বে এবং অন্যান্য দেশের মহান বিপ্লবে। সেই হাজার হাজার বিপ্লবী শহিদের

তৎকালীন বা সমসাময়িককালের সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চাওয়ার ও পাওয়ার কিছুই ছিলো না। ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখীজীবনের সোপান রচনা করতে গিয়েই তারা হাসিমুখে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তাই ত্যাগ তিতিক্ষা রক্তপাত ব্যতীত প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কোনো আদর্শও যা ব্যাপক মানুষের শান্তির দিশারা তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হয় না, হবে না ত্যাগ তিতিক্ষা ও আত্মত্যাগ ব্যতীত।

মানুষ মরণশীল। বিপ্লব ও আদর্শ চিরঞ্জীব। একজন বিপ্লবী শান্তির আদর্শ তথা সাম্যবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে মৃত্যুকে বরণ করতে দ্বিধা করে না। কারণ সে জানে তাকে অবশ্যই পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে কিন্তু তার চিন্তা ধ্যান আদর্শ এবং তার বিপ্লবী কর্মোদ্দীপনার ইতিহাস রয়ে যাবে, ভবিষ্যৎ মানুষ তা থেকে অনুপ্রাণিত হবে।

শোষক-স্বৈরাচারী প্রতিক্রিয়াশীলচক্র ও তাদের দালালগোষ্ঠীর কাছে উপরোক্ত বাণী অর্থহীন। তারা ত্যাগ তিতিক্ষা ও কোন জনহিতকর বিপ্লব ও আদর্শের ধারে কাছে নেই। উপরোক্ত চিন্তাধারায় তারা বিশ্বাসীও নয়। তারা চায় শুধু তাৎক্ষণিক ও জীবনব্যাপী ব্যক্তিসুখ ও ব্যক্তিস্বার্থ। তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট এই যে, এরা চায় তাদের ঐ সুখ ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রতারণা, শঠতা, প্রবঞ্চনা শোষণ অত্যাচার নির্যাতনের মাধ্যমে ব্যাপক সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রাখতে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আসনে চিরসমাসীন থেকে প্রভাব প্রতিপত্তি ঠাঁট ডাট বজায় রাখতে। এদের স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যেই এরা রক্তপাত হিংসা গৃহযুদ্ধ ধ্বংস ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মের পথ অবলম্বন করে। তাই প্রকৃত শান্তিকামী মানবদরদী সমাজতন্ত্রীদের বিপ্লবের পথ অবলম্বন ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নেই। শোষণহীন অত্যাচারহীন বঞ্চনাহীন শান্তিবাদী প্রগতিশীল ও কল্যাণধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই অনিবার্যভাবে বিপ্লবের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। শোষক প্রতিক্রিয়াশীল-অত্যাচারীর দল সেই বিপ্লবের দাবানলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। সুতরাং মানবজাতির সার্বমাঙ্গলিক ও চিরাকাংখিত শান্তির জন্য, শোষণ উৎপীড়ন অত্যাচার থেকে মুক্তিলাভের জন্য এই দুঃখ ও বেদনাদায়ক বাস্তবতাকে মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এ প্রসঙ্গে মনীষী কার্লমার্কসের উক্তিটি বড়োই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেনঃ "বলপ্রয়োগ হলো সেই ধাত্রী, যে নতুন সমাজের জন্মগ্রহণে সাহায্য করে।" তাই দুঃখ ও বেদনাদায়ক মনে করে কেউ যদি নতুনের আগমনকে ঠেকিয়ে রাখতে চায় সেটা হবে অন্যায় এবং তা আরো হবে ধ্বংস ও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সামিল।

সৃষ্টি মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তির ফল। মেহনতী শ্রমজীবী শোষিত মানুষ বল প্রয়োগের আতংককে নীরবদর্শক হয়ে সৃষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকবে না। তাই এ পর্যায়ে রক্তপাত, হিংসা, সংঘাত ও সংঘর্ষের পথ অনুসরণ করা উচিত কিনা, আর বলপ্রয়োগ ব্যতীত বিপ্লব সম্ভবপর কিনা তা একজন বিপ্লবী সমাজবিজ্ঞানীর নিকট কোন প্রশ্ন নয়। সমাজের নতুন সৃষ্টি, বিকাশ, কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই বিপ্লব ঘটাতে হবে। সেই বিপ্লব যদি হয় রক্তপাতের তাতে আপত্তির কিছু নেই। এটা হলো শোষক সমাজের চাপিয়ে দেয়া হিংসা প্রতিরোধের অনিবার্য পরিণতি মাত্র।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যেমন প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, সমাজতন্ত্র না, তেমনি শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সামাজিক ব্যবস্থায় শ্রেণীসমন্বয়, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব-সহমর্মিতা-শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ সমাজের ধনিকগোষ্ঠীর ধনসম্পদের দম্ভ, শোষণের উদগ্রলালসা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের ফলে সমাজে প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার সূত্রপাত ঘটে। সমাজ তখন দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হলো শোষক বা ধনিক যারা মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫%- ৭% ভাগ। অপরটি হলো শোষিত বা দরিদ্র যারা মোট জনসংখ্যার ৯৩% -৯৫% ভাগ। তাই এ সমাজে শোষক শোষিতের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এ দ্বন্দ্বভিত্তিক দুটি শ্রেণী সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একে অপরের বৈরীশক্তি। একটি শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ওপর শাসন শোষণ অত্যাচার হিংসা বলপ্রয়োগ এবং সর্বপ্রকার প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে ভোগ বিলাসের সঙ্গে জীবনযাপন করবে, আর অপরশ্রেণী শোষিত অত্যাচারিত প্রতারিত হবে, জঠর জ্বালায়, আশ্রয়হীন, স্বাস্থ্যহীন সর্বহারায় পরিণত হয়ে ধুকে ধুকে মরবে, মানবেতর জীবনযাপন করবে—সেই ক্ষেত্রে শ্রেণী সমন্বয়, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি গাঁজাখোরি শ্লোগান বৈ আর কিছু নয়। এ সবই বিপ্লবী কার্যক্রমের বাইরে। বিপ্লবের প্রকৃতি এই যে, বিপ্লব সমাজে শ্রেণীসত্ত্বাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। সবার জন্যে প্রেম বা দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, গণতন্ত্র, এগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে তখন যখন সমাজে কোন শ্রেণী, শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, স্বৈরাচার থাকবে না। শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণীবিভেদ প্রভৃতি সমূলে উচ্ছেদ করাই হলো বিপ্লবের লক্ষ্য। এ সব না করে যারা সমাজে শ্রেণীসমন্বয়, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্র ও দেশপ্রেমের কথা বলেন তারাই প্রতিবিপ্লবী-প্রতিক্রিয়াশীল শোষক সমাজের সেবাদাস।

'বিপ্লব' কথাটা কোনো শাস্ত্রীয় বিধানের অপরিবর্তনশীল বা 'ডগমাটিক' কোন

বিষয় নয়। সামাজিক পরিবেশ—বিশেষতঃ সমাজের পরিবর্তন পরিবর্ধন ধারায় বিপ্লবের নিয়মনীতি ও গতিধারা পরিবর্তনশীল ও সংশোধনশীল। সমাজের যাবতীয় সৃষ্টির দ্বন্দ্বমুলক বস্তবাদী কার্যক্রমের সাথে বিপ্লব সম্পৃক্ত। সুতরাং কোনো তত্ত্বই চিরস্থায়ী বা চিরন্তন নয়। অবস্থা ও পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে তত্ত্বেরও পরিবর্তন স্বাভাবিক। এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য। সুতরাং অকেজো বা ব্যাক ডেটেড তত্ত্ব বা আইডিওলজি আঁকড়ে থাকার অর্থই গোঁড়ামির সামিল। সমাজের বাস্তব অবস্থার আলোকে তত্ত্বের উন্নতি ও বিকাশ ঘটাতে হবে। এটাই সৃষ্টিশীল জগত ও বিপ্লবের মূল কথা।

বর্তমান যুগ দ্রুত পরিবর্তন বা বিবর্তনের যুগ। শ্রমজীবি মেহনতী মানবগোষ্ঠী আজ পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রেষ্ঠ শক্তি। কতিপয় রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংস্থা গড়ে উঠেছে। এক দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সাথে অন্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর যোগাযোগ ও সহযোগিতা গড়ে উঠেছে। শ্রমিকশ্রেণীর সাথে নিজেদের একাত্মতা প্রকাশ করছেন সমাজের বুদ্ধিজীবি লেখক সাহিত্যিক তথা গোটা সমাজতন্ত্রীরা। এমন কি সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদের কবল থেকে স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার জন্য এবং একচেটিয়া পুজিপতিদের ধনিকদের শোষণ ও আগ্রাসন থেকে জাতীয় অর্থনীতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় পাঁতিবুর্জোয়ারাও শ্রমিকশ্রেণীর সাথে হাত মেলাচ্ছে। ব্যাপক চেতনার উদয় হয়েছে জনসাধারণের মনে শান্তি সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার সপক্ষে। এ সবই সমাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং মেহনতী শ্রমজীবি মানুষের বাস্তব চিন্তাশক্তি ও রাজনৈতিক সচেতনতার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শোষকগোষ্ঠী সামরিক অভ্যুত্থান, রক্তাক্তোপায়ে ও গৃহযুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ কোন কোন দেশে নাও নিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্যে বিপ্লবীদের কার্যক্রমেও পরিবর্তন আসতে পারে। যে-সব দেশের শ্রমজীবি মেহনতী মানুষের ঐক্য প্রবল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং ধনিকশ্রেণীর বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রধানতম উপাদান সশস্ত্র বাহিনী পাকাপোক্ত বা শক্তিশালী নয়, সেই সব দেশে রক্তপাতহীন ও বলপ্রয়োগহীন বিপ্লবী পরিবর্তনের সম্ভাবনা অধিক। তাই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যদি শ্রমিকশ্রেণী একতাবদ্ধ হয় এবং ব্যাপক জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে মুষ্ঠিমেয় শোষক ধনিক প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের পক্ষে গৃহযুদ্ধ, সামরিক হস্তক্ষেপ বা বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকবে না। সুতরাং সমাজের জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বলপ্রয়োগ করা বা বলপ্রয়োগ নয়, এটা বিপ্লবীদের ভাবনার বিষয় নয়। কারণ

বিপ্লবের কোনো গৎ বাঁধা নিয়ম নেই। সমাজের বাস্তব অবস্থা ও চলমান অবস্থার প্রেক্ষিতেই এর গতিধারা নির্ধারিত হবে।

সুতরাং উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হতে পারি যে, বিপ্লবের অর্থ নিছক রক্তপাত হানাহানি, ধ্বংস বা বলপ্রয়োগ নয়। এর লক্ষ্য বিকাশ। উন্নতি। সৃষ্টি। গড়া।

সমাজ ও ব্যাপক জনগণের সার্বিক কল্যাণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রেণীহীন শোষণহীন বৈষম্যহীনসমাজ প্রতিষ্ঠা, জনগণের মধ্যে ঐক্য-ভ্রাতৃত্ব-সহমর্মিতা-সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠা, অপরের প্রতি ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধাবোধ, উৎসর্গকৃত ও নিবেদিত প্রাণ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয়, আত্মসংযম, আত্মবিশ্বাস, কর্মনিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ, শৃংখলাবোধ, কর্তব্য পরায়ণতা, নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণাবলীর উত্তরণ ও বিকাশ ঘটিয়ে 'আমরা সকলে পরের তরে'—এই মহান নীতির মাধ্যমে সমাজের সমষ্টিগত মানুষের সুখ-শান্তি-সম্ভোগ-সমৃদ্ধি-সাম্য-স্বাধীনতা ও মুক্তি আনয়ন ও তা সংহত ও নিশ্চিতকরণই বিপ্লবের প্রকৃত আদর্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও গতিপ্রকৃতি।

এটাই হলো বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনায়, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় এবং তাঁর বাস্তব পদক্ষেপের মধ্যে সামজিক বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে তাঁর রাজনৈতিক আর্থসামাজিক প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার দিকদর্শন ও কর্মসূচী।

❐